ছাত্র জীবন



শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ।

ছাত্র-জীবন

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
এম.এ., পিএইচ.ডি., এফ.এন.আই.
(ভাস্কর)

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CHHATRA - JIVAN

By Dr. Jyotirmoy Ghosh
M.A. (Cal.), Ph.D. (Edin.), F.N.I.

Price : Rs. Two only.

প্রকাশক ঃ
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
৯ সত্যেন দত্ত রোড
কলিকাতা-২৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওঅর্কস
প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট অঙ্কন ঃ
অসীম মুখোপাধ্যায়
১০বি যতীন দাস রোড
কলিকাতা-২৯

মূল্য ঃ দুই টাকা মাত্র

ভূমিকা

আমাদের ছাত্রসমাজ বর্তমানে বিবিধ প্রকার সমস্যায় জর্জরিত এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সার্থক বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি পড়িয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরলোকগত রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমান বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় অতিশয় প্রীত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের কথা, একখানি মুদ্রিত পুস্তক তাঁহার হস্তে দিবার সুযোগ পাইলাম না।

ছাত্রগণকে বা শিক্ষকগণকে অধ্যয়ন বা আচরণ সম্পর্কে কোন নূতন কথা বলিবার স্পর্ধা আমার নাই। কতকগুলি চিরন্তন এবং প্রয়োজনীয় কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আমরা বা আমাদের পুত্রকন্যারা অনেক কথা জানি এবং বুঝি, কিন্তু তথাপি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, কর্তব্যপথের বাধা সম্বন্ধে সচেতন হইতে হয়। আমার উদ্দেশ্য কিঞ্চিন্মাত্র সফল হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

পুস্তকখানির এই সংস্করণটি "Second Five Year Plan—Development of Regional Languages"-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল এবং "The popular price of the book has been possible through a subvention received from the Government." এজন্য ইহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

মানবজীবনের একটি বিশিষ্ট সময় ছাত্রজীবন। একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে প্রথমে ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে সমগ্র অট্টালিকাটি দৃঢ় এবং স্থায়ী হইতে পারে না। ছাত্রজীবনও তেমনি জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি সুষ্ঠুরূপে গঠিত না হইলে পরবর্তী জীবন সুখময় সুন্দর ও শান্তিময় হইতে পারে না।

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মোটামুটি আমরা ছাত্র-জীবন বলিতে পারি। ইহার পরেও অধ্যয়ন ও অনুশীলন চলিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যেই ছাত্রজীবনের প্রকৃতি ও গঠন প্রায় স্থির হইয়া যায়।

এই সময়ে শরীরের অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস প্রভৃতি বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। এই বৃদ্ধির সময়ে ইহার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখা কর্তব্য। এই সময়ের মধ্যে শরীরের বিভিন্ন অংশের যে বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়, তাহা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি মূল্যবান। ইহার পরে আরও কয়েক বৎসর যাবৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়া থাকে। তখন ছাত্রাবস্থা প্রায় শেষ হইয়া যায় এবং যে সকল অভ্যাস, রুচি এবং আদর্শ ছাত্রাবস্থায় অর্জিত হয়, তারই ফল ক্রমশঃ ফলিতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, এই সময়ে শরীরের ও স্বাস্থ্যের যে অবস্থা থাকে, পরবর্তী জীবনেও অনেকাংশে সেইরূপই চলিতে থাকে। ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারেই হয় না, তাহা নহে, তবে উহা প্রায় নগণ্য। ছাত্রাবস্থায় যাঁহাকে ডিসপেপসিয়া রোগে ভুগিতে দেখা যায়, পরবর্তী জীবনেও তিনি সহজে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। শরীর ও স্বাস্থ্যের ভিত্তিস্থাপনের পক্ষে ছাত্রজীবনই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে উদ্যম থাকে, শক্তি থাকে, চিত্তের প্রফুল্লতা

থাকে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংসারিক দায়িত্ব বা উদ্বেগ থাকে না। এই জন্য এই সময়টি অনন্যমনা হইয়া নিজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

কদভ্যাস বর্জন ও সদভ্যাস অর্জন করিবার পক্ষে ছাত্রজীবনই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে যে সকল অভ্যাস আয়ত্ত হয়, প্রায়শই তাহা সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়। ছাত্রজীবনে যিনি প্রাতরুত্থান অভ্যাস করেন নাই, তাঁহার পক্ষে পরবর্তী জীবনে প্রাতরুত্থান অভ্যাস করা প্রায় অসম্ভব। ছাত্রজীবনে যিনি প্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় দিয়াছেন, পরবর্তী জীবনে তাঁহার পক্ষে এই অভ্যাস প্রায়শই স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। ছাত্রজীবনে যিনি সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেন নাই, পরবর্তী জীবনে তাঁহার পক্ষে সত্যনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। ছাত্রজীবনে যিনি শ্রমবিমুখ ছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাঁহার পক্ষে শ্রমশীল হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রজীবনে যিনি ধূমপানাদি কদভ্যাস অর্জন করেন, পরবর্তী সমগ্র জীবনে সে অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া থাকে। তেমনি অপর দিকে, ছাত্রজীবনে যিনি শ্রমশীল ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, দেখা যায়, পরবর্তী জীবনেও তাঁহার অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা অক্ষুণ্ণ আছে। ছাত্রজীবনে যিনি মিতব্যয়ী, পরবর্তী জীবনেও তিনি মিতব্যয়ী হইয়া থাকেন। ছাত্রজীবনে যিনি স্বাবলম্বী ছিলেন, পরবর্তী জীবনেও তিনি স্বাবলম্বনের মর্যাদা সর্বদা উপলব্ধি করেন। ছাত্রজীবনে যিনি জ্ঞানার্জনের জন্য সতত উন্মুখ ছিলেন দেখা যায়, পরবর্তী জীবনে বিবিধ বাধার অন্তরালেও তাঁহার সেই স্পৃহা জাগরূক রহিয়াছে।

ছাত্রজীবনেই মানুষের মনের বিবিধ গুণ বিকশিত হইতে থাকে। এই সময়ে তাহার অবাধ কল্পনা তাহাকে মহত্তর আদর্শের পথে পরিচালিত করে। তাহার এই কল্পনা, এই উদারতা, এই উচ্ছলতা, এই সজীবতা,

এই চঞ্চলতা যথাযথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইলে ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে গুরুতর ফল প্রসব করিতে পারে। ছাত্রজীবনে যিনি আমোদপ্রিয়তা বা লঘুচিত্ততার অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ সম্ভব হইবে না। ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র ঠিক কি হইবে, তাহা অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই পূর্বাহ্ণে নির্ণয় করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক বা যেরূপই হউক, তাহাতে যশ ও সাফল্য অর্জন করিতে হইলে যে সকল মানসিক গুণের আবশ্যক, তাহার অর্জন ও অনুশীলন ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য। মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন কর্মই অবলম্বন করুন, যে কোন পথই অনুসরণ করুন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানসঞ্চয় অতীব আবশ্যক। যাঁহারা শুধু দৈহিক বল দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানসঞ্চয় আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধির অনুশীলন ও ব্যবহার দ্বারা স্বকর্তব্য পালন করেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। এই সকল জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট সময় ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে যাঁহারা কৌতূহলী, জ্ঞানলিপ্সু, পরবর্তী জীবনেও তাঁহারা বিবিধ প্রকারে জ্ঞানার্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন।

বিবিধ প্রকার অভ্যাসের সমষ্টিকে স্বভাব বলা যাইতে পারে। আবার বিবিধ প্রকার স্বভাবের সমষ্টিকে চরিত্র বলা যাইতে পারে। এই সকল অভ্যাস, স্বভাব ও চরিত্র একত্রিত করিয়াই মানুষের জীবন গঠিত হয়। এই সকল অভ্যাস প্রভৃতি গঠন ও নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত সময় ছাত্র-জীবন। এই জন্যই ছাত্রজীবন মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ অধ্যায়। মনুষ্যত্ববিকাশের প্রারম্ভ ছাত্রজীবনে। একটি ফুল বা ফলের গাছ যতদিন বড় না হয়, ততদিন তাহাকে বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয়, যত্ন করিতে হয়, জল দিতে হয়, সার দিতে হয়।

নতুবা উহাকে গরু ছাগলে খাইয়া ফেলিতে পারে বা সার প্রভৃতির অভাবে নিস্তেজ ও নিষ্প্রাণ হইয়া যাইতে পারে। তেমনি ছাত্রজীবনে মানুষের চারিদিকে বিবিধ সংযমের বেড়া না দিলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে না। পারিপার্শ্বিক বহু প্রকার আপৎপাতে ও অবাঞ্ছনীয় প্রভাবে তাহার মানসিক উন্নতি ও পরিণতি ব্যাহত হয় এবং অযত্নরক্ষিত এবং অবহেলিত ফুলগাছের মত তাহার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বা বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

মানুষের আকৃতি যেমন অনেক ক্ষেত্রেই পিতামাতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের ন্যায় হইয়া থাকে, তেমনি তাহার প্রকৃতিও বহুলপরিমাণে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া থাকে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সঙ্গ, প্রভৃতিও মানুষের প্রকৃতিগঠনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অতি সজ্জন ব্যক্তির পুত্রও সঙ্গদোষে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে অসৎ ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ছাত্রজীবনে স্বীয় অভ্যাস ও প্রকৃতি সুগঠিত না হইলে পরবর্তী জীবনে সংসারের বিবিধ প্রকার অসৎ প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছাত্রজীবনের শৈথিল্যহেতু মনের সংকল্প ও চরিত্রের দৃঢ়তা জন্মিতে পারে নাই। ইহার ফলে পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত সদ্‌গুণাবলী অথবা বংশগত নিষ্ঠা ও সদাচরণ বিস্মৃত হইয়া বিবিধ প্রকার অধঃপতনের পথে জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়।

ছাত্রজীবন যাহাতে সুষ্ঠুরূপে যাপিত হয়, ছাত্রজীবনে যাহাতে বিবিধ প্রকার শৈথিল্য না জন্মে, ছাত্রজীবনের কর্তব্যগুলি যাহাতে যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়, ছাত্রজীবনের ভুলগুলি যাহাতে পরিহার করা যায়, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা এই প্রবন্ধগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সব পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে মনোমত, গৃহীত

বা প্রতিপালিত হয়তো হইবে না। তথাপি একটি বলিষ্ঠ প্রাণবান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে এই প্রবন্ধনিচয়ের অধিকাংশ বিষয়ই সহজ, স্বাভাবিক, সরল এবং সংগত মনে হইবে। ইহার দ্বারা যদি আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দের জীবনগঠনে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা হয়, তাহা হইলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রবন্ধগুলি বিশেষত স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের উদ্দেশে লিখিত। সেইজন্য যথাসম্ভব সহজ ভাষায় আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গুরুগম্ভীর বড় বড় কথা অপেক্ষা সরল ও সহজ কথা ছাত্রদিগের মনের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া মনে হইয়াছে।

পিতামাতা

জগতে পিতামাতা অপেক্ষা সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেহ নাই। সন্তানের পক্ষে পিতামাতা সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ। পিতামাতাকে সর্বদা সর্বতোভাবে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় দ্বারা আনন্দবর্ধন করিবে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই তপস্যার ধন। পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন। এই কথাগুলি শুধু কবির কল্পনা নহে। পিতামাতাকে সর্বকালে ও সর্বদেশেই পূজনীয় বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যের প্রারম্ভে জগতের পিতা-মাতাকেই বন্দনা করিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

যে রামনাম আমাদের সমগ্র দেশে এত পবিত্র, সেই রামচরিত্রের প্রধান উপাদান পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি। ইহারই জন্য রামচন্দ্র এবং তাঁহার পত্নীর সমগ্র জীবন শুধু পরম দুঃখময় হয় নাই, তাঁহাদের সাংসারিক ও দাম্পত্যজীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

ছাত্রজীবনেই প্রথম সদসদ্‌বিচার ও ন্যায়-অন্যায়-বিচার আরম্ভ হয়। এই সময়ে সকল ছাত্রেরই কর্তব্য পিতামাতাকে স্নেহ, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা প্রীতিবর্ধন করা। পিতামাতার সহিত সর্বদা অতিশয় বিনয়ের সহিত বাক্যালাপ করিবে। কখনও রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিবে না।

ছাত্রদিগের একান্ত কর্তব্য পিতামাতার সহিত সরল ব্যবহার করা। তাহাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, প্রভৃতি বিষয়ে সব কথা অকপট চিত্তে পিতামাতাকে জানানো কর্তব্য। পিতামাতার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। বাড়ীতেই হউক, স্কুলেই হউক বা কলেজেই হউক, তোমরা কোথায় কখন কি কর, কাহার সহিত বেড়াইতে যাও, কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর, প্রভৃতি বিষয়ে অকপট চিত্তে পিতামাতার সহিত আলাপ করিবে। ইহাতে তোমাদের কোনই ক্ষতি হইবে না। অথচ, ইহার মধ্যে কোথাও কোন অন্যায় থাকিলে, তাহা তোমাদের পিতামাতা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। কাহারও সহিত বিবাদ বিসংবাদ হইলে তাহাও অকপটে পিতামাতার কাছে বলিবে। কোন কথা গোপন করিবে না। ছাত্রাবস্থা জীবনের প্রারম্ভ মাত্র। পিতা-মাতার যে অভিজ্ঞতা, যে জ্ঞান, যে বহুদর্শিতা আছে, তাহা তোমাদের নাই। সুতরাং কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা তোমাদের পিতামাতা অনেক বেশি বোঝেন।

সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণে তোমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল কখনো হইবে না।

সন্তান যত বয়স্কই হউক, সে তাহার পিতামাতা হইতে কখনো বড় হইতে পারে না। সুতরাং ছাত্রেরা যতই বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও বিনয়ের কখনো হ্রাস হইবে না। কথায় আছে, স্নেহ নিম্নগামী। পিতামাতা সন্তানকে যেরূপ গভীরভাবে স্নেহ করেন, সন্তানের মনে হয়তো পিতামাতার প্রতি ঠিক সেরূপ গভীর স্নেহ জন্মে না। কিন্তু ভক্তি ও বিনয় দ্বারা সন্তান পিতামাতাকে পরম তৃপ্তি দিতে পারে। এই ভক্তি ও বিনয় ছাত্রদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। ইহার অভাবে ছাত্রজীবনের সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়।

কোন বিষয়ে পিতামাতার সহিত মতদ্বৈধ হইলে, পিতামাতার প্রতি রুষ্ট হওয়া বা কোন প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায়। বিনয়ের সহিত সম্ভ্রমের সহিত পিতামাতার সহিত আলোচনা বা তর্ক করিতে কোন বাধা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রেরা বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের মতই ভ্রান্ত। এবং যদি তাহাদের পিতামাতার মতই ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও উহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ছাত্রজীবনেই জ্ঞানের অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইতে এবং পল্লবিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার নূতন জ্ঞান, নূতন মত, নূতন ভাবধারা ছাত্রের মনে বিবিধ প্রকার আলোড়ন তোলে। সুতরাং পিতামাতার সহিত মতবিরোধ অসম্ভব নয়। কিন্তু এই মতবিরোধকে কখনই কোন প্রকারে কলহে পরিণত করা কর্তব্য নয়। সরল ও অকপট চিত্তে আলোচনা করিলে পিতামাতার সহিত বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যাঁহারা সন্তানকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, যাঁহারা অহরহ সন্তানের মঙ্গলচিন্তায়

নিমজ্জিত রহিয়াছেন, সন্তানের অসুস্থতায় যাঁহারা একান্ত বিচলিত হইয়া পড়েন, বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব হইলে যাঁহারা ভাবিয়া আকুল হন, তাঁহারা কি কখনও সন্তানের সহিত কলহ করিতে পারেন ?

সাধ্যমত পিতামাতার আদেশ ও উপদেশ পালন করিয়া চলিবে। কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইলে, সে বিষয়ে পিতামাতাকে বিনয় ও নম্রতার সহিত বুঝাইয়া বলিবে। কখনও ঔদ্ধত্য বা অবিনয় প্রকাশ করিবে না। কখনও উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাইবে না। ইহাতে তোমাদের নিজেদের স্বভাবের বিকৃতি প্রকাশ পাইবে এবং পিতামাতার মনেও অত্যন্ত দুঃখ হইবে। বিনা কারণে পিতামাতার মনে দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য।

অসংগত অনুরোধ বা আবদার দ্বারা পিতামাতাকে বিব্রত করিবে না। মনে রাখিও, পিতামাতা সর্ববিষয়ে তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তোমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই চিন্তা করিতেছেন। তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকিলে এবং তাহার পূরণ সাধ্যায়ত্ত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা পূরণ করিবেন। কিন্তু তোমাদের মনে এমন অনেক ইচ্ছার উদয় হইতে পারে, যাহা তোমাদের পক্ষে সংগত নয়, বা তাহার পূরণ করা পিতামাতার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সকল স্থলে পিতামাতা যদি তোমাদের ইচ্ছা বা আবদার পূর্ণ না করেন, বা করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বৃথা অভিমান করিয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বা অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া পিতামাতার মনে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য নয়।

যদি কখনও কোন অন্যায় কার্যের প্রতিবাদে বা সংশোধনার্থে পিতামাতা তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তোমরা দুর্বিনীত ব্যবহার করিবে না। প্রথমে নীরবে ভর্ৎসনা গ্রহণ করিবে। পরে ধীরচিত্তে স্বকৃত অন্যায়ের প্রতিকার করিবে এবং

ভবিষ্যতে যাহাতে আর তদ্রূপ অন্যায় না হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হইবে। পিতামাতা উচ্চৈঃস্বরে ভর্ৎসনা করিলেই তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ জ্ঞাপন কখনই কর্তব্য নয়। এইরূপ কলহে পিতা-মাতার সহিত সন্তানের যে স্নেহমমতা ও শ্রদ্ধাভক্তির সহজ সম্বন্ধ আছে, তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে কোন উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলেই পিতামাতার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদিন প্রাতে পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। এরূপ না করিলেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবার অভ্যাস করিবে। কোন দূরস্থানে যাইবার পূর্বে, হোস্টেলে যাইবার পূর্বে, কোন দূরস্থান হইতে ফিরিবার পর, বিজয়াদশমীর দিন, প্রভৃতি সময়ে পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহা একটা অর্থহীন প্রথা নহে। মনের স্বাভাবিক ভক্তিরই ইহা প্রকাশ। পরীক্ষা দিবার জন্য যাত্রার প্রাক্কালে বা অন্য কোন গুরুতর কার্য উপলক্ষ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে পিতামাতার পদধূলি লইবে। ইহা ঈপ্সিত কর্মে সাফল্য আনিয়া দিবে, এজন্য নহে। কোন গুরুতর কর্মের প্রচেষ্টায় পিতামাতার আশীর্বাদ এবং সন্তানের ভক্তির বিনিময়ের মধ্যে একটা প্রশান্ত মাধুর্য আছে, যাহাতে উভয়পক্ষের মনই সুপ্রসন্ন হয়।

তোমাদের ছাত্রাবস্থাতেই যদি তোমাদের পিতামাতা রুগ্ন হইয়া পড়েন বা বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বার্ধক্য বা রোগজনিত দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিবে না বা কোন প্রকার অবিনয় বা অশিষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। ইহাতে তাঁহাদের কষ্ট শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। কোনমতেই পিতামাতার মনোকষ্টের কারণ হইবে না।

দৈনন্দিন

ছাত্রজীবনে এবং সম্ভবমত পরবর্তী জীবনেও দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি সুশৃঙ্খল ধারা একান্ত আবশ্যক। এখানে আমরা ছাত্রজীবনের কথাই বলিতেছি। ছাত্রের পক্ষে প্রত্যেকটি দিন অতি মূল্যবান। একটি দিনও বিশৃঙ্খলভাবে যাপন করা উচিত নয়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবে। পাঁচটা হইতে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে গাত্রোত্থান করা কর্তব্য। যদি নিজে হইতেই ঐ সময়ে ঘুম না ভাঙে, তাহা হইলে একটি এলার্মিং ঘড়ি রাখা উচিত। ছয় মাস বা এক বৎসর ক্রমাগত এই অভ্যাস আয়ত্ত হইলে পরে আর ঘড়ির প্রয়োজন হইবে না। ঘড়ির শব্দ শুনিয়া বা না শুনিয়াও সময়মত ঘুম ভাঙিবামাত্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িবে। নচেৎ পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। তারপর মুখ হাত ধুইয়া কিছু ব্যায়াম করিবে। বেশিক্ষণ বা বেশি সময় ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যায়ামের পর কিছু খাবার খাইবে। বাড়ীতে যখন যেরূপ আহারের ব্যবস্থা থাকে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। ইহার জন্য কোনরূপ অভিযোগ করিবে না বা পিতামাতাকে বিরক্ত করিবে না। সর্বদা মনে রাখিবে তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সাধ্যের বাহিরে কোনরূপ আবদার করা তোমাদের কর্তব্য নয়। যদি হোস্টেলে থাক, তাহা হইলে নিজের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জলখাবারের ব্যবস্থা করিবে।

ইহার পরই গভীর মনোযোগ দিয়া পড়িতে বসিবে। যে সকল

বিষয়ে কিছু মুখস্থ করিবার আছে, সেইগুলি প্রথমেই পড়িবে। প্রাতঃকালে মন স্থির এবং শান্ত থাকে। এই সময় মুখস্থ করিবার পক্ষে প্রশস্ত। তারপর অন্যান্য পাঠ্যবিষয় পড়িবে। অনেক পরিবারে চাকর নাই, থাকিলেও অনেক সময়ে তাহারা অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া বাজার করিবার ভার সম্পূর্ণ চাকরের উপর ছাড়িয়া দিলে বাজারের ভাল জিনিসগুলি অনেক সময়েই কেনা হয় না, অথচ দাম বেশি পড়ে। এই সকল কারণে হয়তো তোমাদিগকে একবার বাজার করিতে যাইতে হইতে পারে। তোমাদের নিজের স্থবিধা অনুসারে সকালে বা সন্ধ্যার সময়ে বাজার করিবার ব্যবস্থা করিতে পার। এজন্য নিতান্ত যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত সময় নষ্ট করিবে না। যদি বাড়ীতে পিতা বা অন্য বয়স্ক ব্যক্তি বাজার করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তোমাদের বাজার করিতে যাইবার প্রয়োজন হইবে না। একমনে সমস্ত সকাল পড়াশুনা করিতে পারিবে।

সময়মত স্নানাহার করিবে। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া স্কুলে বা কলেজে যাইবে না। আহারের অব্যবহিত পরেই ছুটিয়া গিয়া বাস বা ট্রামে উঠা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। চলন্ত ট্রামে বাসে কখনও উঠা-নামা করিবে না। অনেক ছাত্র ইচ্ছা করিয়া চলন্ত বাসে বা ট্রামে উঠা-নামা করিয়া থাকে। সব সময়েই যে দুর্ঘটনা হয়, তাহা নহে। কিন্তু কখনও একটি মাত্র দুর্ঘটনাতেই সমগ্র জীবনের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। স্থতরাং এ বিষয়ে অযথা সাহস বা 'বাহাদুরি' দেখান অত্যন্ত অন্যায়।

বিদ্যালয় (স্কুল বা কলেজ) হইতে সময়মত বাড়ী ফিরিবে। বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হইয়া গেলে অযথা বিলম্ব করিবে না। ইহাতে পিতামাতার উদ্বেগ বাড়ে, বৈকালের আহারাদির সময় বিপর্যস্ত হয়,

দৈনন্দিন অভ্যাস বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। সময় সম্পর্কে বিশৃঙ্খলতা অতীব নিন্দনীয়। বাড়ী ফিরিয়া কিছু খাবার খাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে। পরে কোন খেলার ব্যবস্থা থাকিলে খেলিতে যাইবে। মফস্বলের ছাত্রদের এ বিষয়ে খুব সুবিধা আছে। বাড়ীর কাছেই একটা খেলার জায়গার কখনো অভাব হয় না। কিন্তু কলিকাতায় সকলের সে সুযোগ হয় না। বাড়ীর নিকটেই সুবিধামত খেলার ব্যবস্থা অনেক ছাত্রই করিতে পারে না। যে সকল ক্লাব আছে, তাহাও হয়তো বাড়ীর কাছে নয়। সে সকল ক্লাবের সভ্য হইলে অর্থ ও সময়ের প্রচুর অপব্যয় হয়। এই অপব্যয় বাঞ্ছনীয় নয়। কাহারও অতিরিক্ত পরিমাণে খেলার ঝোঁক থাকিলে এই সকল ক্লাবে খেলিতে পার। কিন্তু যাহাতে সময়ের অপচয় না হয় এবং পড়াশুনার ক্ষতি না হয়, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যখনই দেখিবে খেলার জন্য পড়াশুনার কোন প্রকার ক্ষতি হইতেছে, তখনই উহা পরিত্যাগ করিবে।

খেলার সুযোগ না থাকিলে বাড়ীতেই অল্প ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিবে। তারপর মুখ হাত ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার পড়িতে বসিবে। অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম যদি কোন কারণে সহ্য না হয় (অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম), তাহা হইলে নিকটবর্তী কোন পার্কে বা খোলা জায়গায় আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা খুব জোরে হাঁটিবে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তত তিন ঘণ্টা নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করিবে। পড়াশুনা শেষ করিয়া আহার করিবে। আহারের পরক্ষণেই শুইয়া পড়া ভাল নয়। কিছুক্ষণ পাঠ্যের বাহিরে কোন ভাল বই পড়িবে বা ভ্রাতা ভগিনীর সঙ্গে গল্প করিবে। পিতামাতাকে সঙ্গে পাইলে তাঁহাদিগের সহিতও কথাবার্তা বলিবে। স্কুলের বা কলেজের কোন বিশেষ ঘটনা বা কোন আমোদজনক বা হাস্যজনক ব্যাপার প্রভৃতি

লইয়া গল্পসল্প করিতে পার। দশটা হইতে সাড়ে দশটার মধ্যে শুইয়া পড়িবে।

শুধু ধরাবাঁধা কয়েকটি কাজ লইয়া সংসারে থাকা চলে না। কিন্তু ছাত্রের প্রধান কর্তব্য পড়াশুনা। সে বিষয়ে কোন অবহেলা বা অমনোযোগ কিছুতেই যেন না হয়, তদ্‌বিষয়ে অতি যত্নের সহিত তৎপর হইতে হইবে। বাজার করার কথা পূর্বে বলিয়াছি। উহা অবশ্য একটি দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বাড়ীতে কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে, তাহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা বা শুশ্রূষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। কোন আত্মীয়স্বজন বাড়ীতে আসিলে বা কিছুকাল অবস্থান করিলে, তাঁহাদের জন্য কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন হইবে। এই ধরনের অনেক প্রকার ছোট কাজ সকল ছাত্রকেই করিতে হয়। কিন্তু এগুলি এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে পড়শুনার ক্ষতি না হয়। এ ধরনের আকস্মিক কাজের অজুহাতে পড়াশুনার অবহেলা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন করিয়াই হউক, সময় ও সুযোগ করিয়া লইয়া পড়াশুনার কাজটি সুসম্পন্ন করিতেই হইবে। যদি অভ্যাগতদের জন্য স্থানাভাব হয়, তাহা হইলে পার্শ্বস্থ কোন পরিচিত বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। বাড়ীতে কোন কারণে কোন গোলমাল হইলে, যথাসম্ভব সে গোলমাল হইতে দূরে থাকিবে। গোলমালে যোগ দিবার জন্য বা ঔৎসুক্যবশত উপভোগ করিবার জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পড়াশুনা ছাড়িয়া কিছুতেই উঠিবে না।

সর্বদা মনে রাখিবে, তোমরা ছাত্র। পড়াশুনাই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। বই, খাতা, পেন্সিল, কলমই তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্য যাহা কিছু সবই গৌণ। কোন কিছুর অজুহাতেই পড়াশুনার প্রতি

শৈথিল্য আসিতে দিবে না। পড়াশুনার শেষ নাই। কখনও পড়াশুনা বেশি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। যত বেশি পড়াশুনা করিবে, ততই মনে হইবে, যথেষ্ট হইতেছে না।

এক একটি দিন লইয়াই মাস ও বৎসর হয়। সুতরাং প্রতিটি দিন সুশৃঙ্খলভাবে অতিবাহিত হইলে, সমগ্র বৎসরও সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হইবে। দিন অবহেলিত হইলে মাস ও বৎসরও অবহেলিত হইবে। কোন অনুতাপ বা কোন অনুশোচনাই ইহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। অনেক ছাত্র পরীক্ষার পূর্বে সব বাকি পড়া শেষ করিয়া লইবার আশায় বৎসরের দিনগুলি অবহেলায় কাটাইয়া পরিশেষে অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যায়। বহুদিনের বাকি পড়া অল্প দিনে শেষ করা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রচেষ্টায় শরীর ও মনের যে ক্ষতি হয়, তাহা অপূরণীয়।

বিদ্যালয় যখন খোলা থাকে, তখন প্রত্যহ অন্তত ছয় ঘণ্টা এবং যখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে, তখন অন্ততপক্ষে নয় ঘণ্টা অধ্যয়ন বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের পক্ষে দিবানিদ্রা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

বিদ্যালয়

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবে। কখনও বিলম্ব করিবে না। বেশি পূর্বেও যাইবে না। বেশি পূর্বে যাইতে হইলে বাড়ী হইতেও বেশি পূর্বে যাত্রা করিতে হয়। তাহাতে সকালের মূল্যবান সময় খানিকটা নষ্ট হইয়া যায়। তাছাড়া ক্লাস বসিবার বেশি পূর্বে

গিয়া শুধু শুধু বৃথা আলাপ বা বৃথা কাজ করিয়া সময় নষ্ট করা হয়।

ক্লাসে যথাসম্ভব শিক্ষকের নিকটে স্থির হইয়া বসিবে। শিক্ষক যাহা বলেন, অত্যন্ত মন দিয়া তাহা শুনিবে এবং বোর্ডে যাহা লেখেন, তাহা মন দিয়া পড়িবে। যে সকল কথা বলেন বা লেখেন, তাহার মধ্যে যেগুলি নূতন বা অতিপ্রয়োজনীয় মনে হয়, সেগুলি খাতায় লিখিয়া লইবে।

ক্লাসে বসিয়া অন্য কোন ছাত্রের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। কোন প্রকার হাস্যপরিহাস করিবে না। শিক্ষকের কথা এবং পাঠ্য-বিষয় ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান দিবে না। স্কুলেই হউক বা কলেজেই হউক, কোন বড় ক্লাসে যদি শিক্ষক হইতে কিছু দূরে বসিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগী না হইলে অধ্যাপকের সব কথা শুনিতে পাইবে না। অনেক ছাত্র পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া বৃথা আলাপ করে, অথবা বেঞ্চির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ পাঠ্যবিষয়ের বাহিরে অন্য কোন পুস্তক পড়িয়া সময় কাটায়। এই সকল অভ্যাস অতি নিন্দনীয়।

স্কুলের টিফিনের অবসরে বা কলেজের বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যবর্তী অবসরে কমনরুমে গিয়া নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদ মাসিক বা অন্যবিধ পত্রিকাদি পড়িবে। প্রায় সকল কমনরুমেই নানা প্রকার পত্রিকার ব্যবস্থা থাকে। যে সকল পত্রিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নূতন নূতন খবর বা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় বর্ণিত থাকে, সেই সকল পত্রিকা পাঠ করিবে। এই অবসরে অল্পস্বল্প খেলার ব্যবস্থাও হইতে পারে। অনেক কমনরুমে টেব্‌ল্‌-টেনিসের ব্যবস্থা আছে।

খেলা বা পত্রিকাপাঠ ব্যতীত আরো একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ অবসর-সময়ে করিতে পার। লাইব্রেরীতে গিয়া শিক্ষকের উপদেশ

অনুসারে অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে বিবিধ পুস্তক পড়িতে পার। যদি কোন পুস্তক বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়, তবে তাহা লাইব্রেরী হইতে বাড়ীতে লইয়া যাইবে। পড়া হইয়া গেলে নির্ধারিত দিনে ফেরত দিবে। একসঙ্গে বেশি বই বাড়ীতে লইবে না। তাহাতে কোন লাভ হয় না। শুধু শুধু কতকগুলি বই বাড়ীতে পড়িয়া থাকে। লাইব্রেরীর বইতে কোথাও কোন প্রকার দাগ দিবে না। নিজের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া রাখিবে না। এই সকল কার্য অতীব গর্হিত।

অবসর-সময়ে সহপাঠীদের সঙ্গে বা অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ বা আলোচনা করা ভাল। কিন্তু বেশি প্রগল্‌ভতা ভাল নয়। নানা প্রকার আবশ্যক অনাবশ্যক আলাপে মন লঘু হইয়া যায়। ছাত্র-জীবনের পক্ষে লঘুচিত্ততা ভাল নয়। মনে আনন্দ থাকিবে, উৎসাহ থাকিবে, কিন্তু যখন তখন যে কোন বিষয় লইয়া বৃথা তর্ক, আলোচনা, প্রভৃতি করিবে না। স্কুলে বা কলেজে যাইবার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ এবং তৎসঙ্গে একটি গৌণ উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাশ করা। এই দুইটি উদ্দেশ্যের কথা সর্বদা মনে রাখিলে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

স্কুল বা কলেজের সর্বপ্রকার নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বহু চিন্তা করিয়া ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্যই এই সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কোন নিয়মের মধ্যে অযৌক্তিকতা আছে, এরূপ যদি ছাত্রদের মনে হয়, তাহা হইলে, তাহারা সে কথা কর্তৃপক্ষকে বিনীতভাবে জানাইবে। প্রয়োজন হইলে তর্ক বা আলোচনাও চলিতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যাপার লইয়া দল বাঁধিয়া অশান্তি সৃষ্টি করা

কখনই কর্তব্য নয়। বিশেষত যে সকল বিষয় ছাত্রদের কর্তব্যের বাহিরে, তাহা লইয়া ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রকাশ করা অন্যায়। কোন স্কুল বা কলেজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইলে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হয় ছাত্রদেরই। উত্তেজনার মুখে এ কথা বুঝিতে না পারিলেও উত্তেজনা প্রশমিত হইলেই ইহারা সে কথা বুঝিতে পারে।

সহপাঠীকে বা অন্যান্য ছাত্রদের কাহারও প্রতি ঈর্ষা বা দ্বেষ পোষণ করিবে না। যাহারা পড়াশুনায় অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদের প্রতি এবং যাহারা পড়াশুনায় তেমন ভাল নয়, তাহাদের প্রতি সর্বতোভাবে সমান ব্যবহার করিবে। যদি কেহ কোন বিষয়ে সাহায্য চায়, তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। অবশ্য অন্যায় সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহা পূরণ করিবে না। কেহ যদি অনুপস্থিত হইয়া প্রক্সি দিতে বলে বা পরীক্ষার সময়ে কেহ যদি অন্যায় সাহায্য চায়, তাহাতে কখনই প্রশ্রয় দিবে না। কলহ না করিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবে যে এরূপ কার্য অন্যায়। যাহারা বয়সে বড় বা উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ে, তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। তাহাদের সহিত বিনীতভাবে ব্যবহার করিবে। যাহারা বয়সে ছোট বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়ে, তাহাদিগকে স্নেহ করিবে। ছোট বলিয়া তাহাদের সহিত রূঢ় ব্যবহার করিবে না।

স্কুল বা কলেজের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি করা অত্যন্ত অন্যায়। কোন কারণেই এক দল ছাত্র অপর এক দল ছাত্রকে বিপক্ষ মনে করিবে না। এই অভ্যাস অতীব নিন্দনীয়। ইহাতে নিজের এবং স্কুল বা কলেজের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট হইয়া যায়। খেলার জন্য দল, কোন উৎসব-পালনের জন্য দল, ম্যাগাজিন বা পত্রিকা প্রকাশের জন্য দল বা সমিতি, প্রভৃতি গঠন করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও এ সকল বিষয়ে উপদেশ দিবেন এবং সাহায্য করিবেন।

কিন্তু তুচ্ছ কোন কারণ অবলম্বন করিয়া বা ব্যক্তিগত কোন হিংসা বা আক্রোশের বশবর্তী হইয়া দল পাকাইয়া অশান্তি সৃষ্টি করা নিতান্ত অন্যায়। অনেক সময়ে শিক্ষকেরা এই সকল দলাদলিতে যোগদান করিয়া থাকেন বা ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন। ইহা গুরুতর অন্যায়।

ছাত্রদের কাহারও অসুখ হইলে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি তাহার বাড়ীতে শুশ্রূষার লোকের অভাব থাকে, তাহা হইলে কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে। যদি চিকিৎসার জন্য অর্থাভাব হয়, তাহা হইলে নিজেরা চাঁদা করিয়া সে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমস্ত ছাত্রদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের সুখে দুঃখে সাথী হইতে হইবে। ছাত্রজীবনে নিজের স্বার্থচিন্তা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এই সময়ে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা এবং অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ, প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন সহজ হয়। বিদ্যালয়ে বহুবিধ বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। এই সময়ে মনের সুপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশসাধনে তৎপর থাকা কর্তব্য।

নিজের বিদ্যালয়কে মনেপ্রাণে ভালবাসিবে। কোন কারণে যাহাতে উহার সম্মান ও খ্যাতির লাঘব না হয়, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান হইবে। স্কুলই হউক বা কলেজই হউক, উহার গৃহ, উহার উদ্যান, উহার অভ্যন্তরস্থ সর্বপ্রকার জিনিসপত্র, প্রভৃতির প্রতি মমতা অর্জন করিবে। বিদ্যালয়ের ভৃত্যদিগকে আপনার জন মনে করিবে। তাহাদের সহিত কখনও রূঢ় ব্যবহার করিবে না। বিদ্যালয়টিকে সর্বতোভাবে সুন্দর, মনোরম ও শান্তিময় করিয়া রাখিবে। কোথাও দেওয়ালের গায়ে কিছু লিখিবে না। ইহা একটি অতন্ত কুরুচিপূর্ণ কদভ্যাস। একজন শিক্ষাবিদ বলিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলি দেখিলেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রুচি ও শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটি অনেকাংশে

সত্য। এ বিষয়ে ছাত্রদের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। তোমাদের মন সুন্দর রাখিবে, এবং সেই সৌন্দর্য বিদ্যালয়ের সর্বত্র, সর্ব বিষয়ে প্রতিফলিত হইবে।

শিক্ষক

পুরাকালে শিক্ষাদান ও অধ্যয়ন, এই কার্যগুলিকে গভীর গুরুত্ব প্রদান করা হইত। যিনি শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহাকে গুরু বলা হইত। ছাত্রদিগকে শিষ্য বলা হইত। গুরু শিষ্যের শিক্ষা-জীবনের সমগ্র ভার লইতেন। এই জন্য শিষ্যকে গুরুগৃহে গিয়া বাস করিতে হইত। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কের মত পবিত্র ছিল। শিষ্যের অধ্যয়ন, দৈনন্দিন জীবনযাপন, ধর্মজীবনের বিকাশ, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই গুরুর দায়িত্ব ছিল। শিষ্যও তেমনি গুরুকে পিতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। গুরুকে নমস্কার করিতে বলা হইত—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান-অন্ধকারে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলন করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি। মানবজীবনের সার্থকতা জ্ঞানলাভে এবং চরিত্রগঠনে। এই দুইটি বিষয়ে যিনি শিষ্যকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় কে হইতে পারে?

বর্তমান যুগে এই ঘনিষ্ঠ গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নাই। তাহার প্রধান

কারণ, আমাদিগের সমাজব্যবস্থায় একসঙ্গে বহু ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই জন্য কোন শিক্ষকের পক্ষেই কোন ছাত্রের প্রকৃত গুরু হইবার অবকাশ থাকে না।

শিক্ষাব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, শিক্ষার আদর্শের মূলত কোন পরিবর্তন হয় নাই। গুরু ও শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভব না হইলেও অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহা গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মতই সুন্দর ও সহজ। ছাত্র সর্বদা শিক্ষকের অধ্যাপনা অতি মনোযোগ দিয়া শুনিবে। কখনও কোনরূপে তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইবে না। সকল শিক্ষকের গলার স্বর, কথা বলিবার ভঙ্গী, বক্তৃতা দিবার শক্তি ঠিক একরূপ হইতে পারে না। এই সকল বিষয় লইয়া কোনরূপ মত প্রকাশ করা বা সমালোচনা করা কর্তব্য নয়। শিক্ষকেরা সকলেই বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় তোমাদের চেয়ে অনেক বড়। তাঁহারা প্রাণপণে তোমাদিগকে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কোনপ্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা কর্তব্য নয়।

পিতামাতা যেমন সব সময়ে মুখে বলেন না যে তাঁহারা তোমাদিগকে ভালবাসেন, অথচ তোমরা জান যে তাঁহাদিগের জীবনে তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই প্রধান চিন্তার বিষয়, তেমনি শিক্ষকেরা সব সময়ে তাঁহাদের স্নেহ মুখে প্রকাশ না করিলেও, তোমরা জানিও যে তোমাদের মঙ্গলপ্রচেষ্টাই তাঁহাদের প্রধান কার্য। এই বিশ্বাস মনে থাকিলে, তোমাদের মনে ভক্তি ও ভালবাসার উদয় হইবে।

আবাসিক স্কুল বা আবাসিক কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ বেশি। কিন্তু এ সকল স্থানেও ছাত্রসংখ্যার আধিক্যবশত ঠিক গুরুগৃহের মত অতখানি ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারে না। তথাপি

সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা এগুলি অনেকটা উন্নততর। ছাত্রদের কর্তব্য তাহারা সকল বিষয়েই শিক্ষকদিগের সহিত আলোচনা করিবে। ইহাতে শুধু জ্ঞানলাভ হইবে তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের বাকসংযমের এবং বৃথা-আলাপ-পরিহারের পক্ষে সহায়তা হইবে। শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে শুধু কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকের সম্পর্ক, তাহা নহে। ছাত্রের বিবিধমুখী ঔৎসুক্য, তাহার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের সহায়ক প্রচেষ্টা, তাহার ভবিষ্যদ্‌জীবনের বিবিধ কল্পনা, প্রভৃতি সকল বিষয়েই অধ্যাপক তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাকে সহায়তা করিতে পারেন। ছাত্র বিনয় ও সম্ভ্রমের সহিত শিক্ষকের সহিত সকল বিষয়ে অকপটভাবে আলোচনা করিবে।

তোমাদের মনে কোন কষ্ট বা অশান্তি থাকিলে তাহাও তোমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাঁহারা সর্বদাই তোমাদিগকে সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ছাত্রদের মধ্যে অনেকের মনে একটা অহমিকাপূর্ণ ধারণা আছে যে শিক্ষকেরা তাহাদের অপেক্ষা এমন কি বেশি বোঝেন যে তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন? তাহারা নিজেরাই তো সব বোঝে। এইরূপ অহমিকা অতি নিন্দনীয়। নিজেকে কখনই অতিবুদ্ধিমান মনে করিবে না। বিনীতভাবে একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমাদের অধ্যাপকেরা তোমাদের অপেক্ষা কত বেশি জ্ঞানী। এই সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সহজপ্রাপ্য জ্ঞান ও শিক্ষালাভে অবহেলা করিলে তোমাদেরই ক্ষতি হইবে, আর কাহারও নহে।

বিদ্যালয়-গৃহে বা বাহিরে দীর্ঘদিনের পর সাক্ষাৎ হইলে, শিক্ষকগণকে সবিনয়ে প্রণাম করিবে। ইহা না করিলে শিক্ষকের কোন ক্ষতি হইবে

না। তোমাদের পক্ষে যে আচরণ শোভন ও সুন্দর, তাহারই অপালনের জন্য তোমাদের মনের অবিনয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

শিক্ষকগণের নিকট হইতে কোনরূপ অন্যায় সুযোগ লইবার চেষ্টা করিবে না। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন জানিয়া লইবার চেষ্টা করিবে না। কোন পরীক্ষক-শিক্ষককে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া অন্যায় সুযোগ-গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। কোন ন্যায়বান শিক্ষকই এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না।

কোন অধ্যাপকই সম্পূর্ণ বিনা কারণে কোন ছাত্রকে তিরস্কার করেন না বা কোন প্রকার শাস্তি দেন না। যদি তোমাদের কোনরূপ গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে শাস্তিলাঘবের জন্য আবেদন নিবেদন করিতে পার। কিন্তু কোনমতেই কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিবে না। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক জনসাধারণ এবং পুলিশের সম্পর্ক নয়। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিক্ষক বা ছাত্র কেহই এই মধুর এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ককে অযথা তিক্ত করিয়া তুলিবেন না। ছাত্রের মনে আঘাত লাগে এমন কোন ব্যবহার শিক্ষকেরা করেন না, করা কর্তব্য নয়। তেমনি ছাত্রদিগেরও কর্তব্য কোনমতেই অধ্যাপকগণের সম্মানহানির প্রচেষ্টা না করা।

শুধু ক্লাসের পড়াশুনার সময়ে ছাড়া অন্য সময়েও মাঝে মাঝে শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সুযোগ সুবিধা হইলে এবং শিক্ষকদের কেহ সম্মত হইলে, তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খেলাধূলা করিবে। স্কুল বা কলেজের পত্রিকা (ম্যাগাজিন) সম্পাদন ও প্রকাশ সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবে। স্কুল বা কলেজের উৎসবাদির সময়ে উঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। এই সকল উপলক্ষ্যে শিক্ষকগণের সহিত যে ঘনিষ্ঠতা হইবে, তাহার অপব্যবহার

করিবে না। কখনও অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অবিনয় প্রকাশ করা সমীচীন নহে। এরূপ করিলে শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্ক ব্যাহত হইবে।

বিদ্যালয়ের বাহিরে, পথে বা অন্য কোন শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে প্রণাম জানাইবে। পদস্পর্শ না করিলেও হাতজোড় করিয়া নমস্কার জানাইবে।

অধ্যয়ন

অধ্যয়ন মানবজীবনের একটি অতি গুরুতর কর্তব্য। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে এবং লোকমুখে আমরা নানা প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং তাহার গভীরতাও অল্প। কোন বিষয়ে বিশেষ এবং গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে অধ্যয়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরা তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পুস্তকের মধ্যে সঞ্চিত করেন। অপরে সেই সকল পুস্তক হইতে নিজের জ্ঞান আহরণ করে। ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য জ্ঞানার্জন। সেইজন্য অধ্যয়নই তাহার প্রধান কর্তব্য। "ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ" —ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা।

অধ্যয়নের সময়ে অন্য কোন দিকে মন দিবে না। যদি এক ঘরে একাধিক ছাত্রকে বাস করিতে হয় এবং অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যমনস্ক হইবার আশঙ্কা খুব বেশি। কারণ ঘরের অন্যান্য

ছাত্রেরাও যদি অধ্যয়ন বিষয়ে সমভাবে মনোযোগী না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ নানা প্রকার গল্প বা আলোচনা বা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিবে এবং তাহাতে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, যাহার এইরূপ কথা বলা অভ্যাস, তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাহার সহিত অযথা ও বৃথা বাক্যালাপ বন্ধ করিবে। অনেক সময়ে চক্ষুলজ্জার জন্য এরূপ করিতে সংকোচ হয়। কিন্তু এরূপ সংকোচ অত্যন্ত অনুচিত। বৃথা বাক্যালাপ দ্বারা অধ্যয়নের যে ক্ষতি হয়, তাহা অপূরণীয়।

যে কোন পুস্তক বা বিষয় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই অব্যবহিত পূর্বে যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা একবার পড়িয়া লইবে। ইহাতে পূর্ব-পঠিত বিষয় স্মরণে আসিবে এবং পরবর্তী পাঠের সুবিধা হইবে। পাঠ্যবিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলিলে পাঠাভ্যাসের এবং পাঠ্যবিষয়ের উপলব্ধি করা সহজ হয় এবং পাঠ্যবিষয় মনে রাখাও সহজ হয়। যেদিন যেটুকু পড়িবার কথা সেইদিনই তাহা পড়িয়া শেষ করিবে। কখনও ফেলিয়া রাখিবে না। স্কুল বা কলেজ যখন খোলা থাকে, তখন প্রতিদিনের নির্ধারিত পাঠ্য নিয়মিতভাবে পড়িয়া যাইবে। তৎসত্ত্বেও যদি কোন বিষয়ে কোন স্থানে কিছু অপঠিত বা অনায়ত্ত থাকিয়া যায়, তাহা পরবর্তী ছুটির সময়ে বেশি সময় পড়িয়া আয়ত্ত করিয়া লইবে। ছুটির সময়ে পাঠ্যবিষয়গুলি বেশি বেশি করিয়া পড়িয়া রাখিলে বিদ্যালয়ের পড়া বাকি পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। বিদ্যালয় খোলা থাকিলে অনেকগুলি বিষয় একত্র পড়িতে হয় বলিয়া কোন বিষয়ই বেশি করিয়া পড়া যায় না। ছুটির সময়ে যে কোন একটি বিষয়ে কিছুদিন ধরিয়া বেশি করিয়া পড়িয়া আগাইয়া রাখা যায়। বিদ্যালয় যখন খোলা থাকে, তখন প্রত্যেক বিষয়ে ক্লাসে যাহা পড়ান

হয়, তাহা বাড়ীতে ভাল করিয়া পড়িবে। কোন স্থানে কোনরূপ অ-পড়া বা অ-বোঝা যেন না থাকে।

পড়িতে পড়িতে যখন তখন উঠিয়া পড়িবে না। অনেক সময়ে ছাত্রেরা খানিকটা পড়িয়াই ক্লান্ত বোধ করে। এই ক্লান্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা ভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে উহা আলস্য। একসঙ্গে একমনে অন্তত চার পাঁচ ঘণ্টা না পড়িলে ক্লান্তিবোধ করা স্বাভাবিক নহে। পড়িবার সময়ে ক্লান্তি নিবারণের একটি প্রধান উপায় পাঠ্যবিষয় পরিবর্তন। অনেকক্ষণ ইতিহাস পড়িতে পড়িতে যদি আর পড়িতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে অঙ্ক লইয়া বসিবে। অঙ্ক কষিতে কষিতে ক্লান্তি মনে হইলে বাংলা বা ইংরাজি সাহিত্যের বই পড়িবে। এইরূপে পাঠ্য-পরিবর্তন করিলে কখনও সহজে ক্লান্তি বোধ হইবে না। পড়িতে পড়িতে ক্লান্তিবোধ হইলে পড়ার প্রতি মনোযোগ কমিয়া যায়। বেশি জোর করিয়া পড়িতে গেলে অনিদ্রা বা অন্য প্রকার শিরোরোগ হইতে পারে। তবে সুস্থ শরীরে এবং আহারাদি বিষয়ে শৈথিল্য না হইলে অধ্যয়নের ফলে সহজে ক্লান্তিবোধ হইবার কথা নহে। এরূপ ছাত্র দেখিয়াছি, যাঁহারা দিনের পর দিন প্রত্যহ বার ঘণ্টা চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিয়াও অসুস্থ হন নাই।

সকলের স্বাস্থ্য ঠিক একপ্রকার নহে। সেইজন্য সকলেই যে প্রত্যহ বার ঘণ্টা চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে পারিবে, ইহা সম্ভব না হইতে পারে। শরীরের স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া কোন কাজই করা কর্তব্য নয়। তবে অধ্যয়নের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকিলে অনেকেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধিক সময় অধ্যয়ন করিতে পারে। অধ্যয়নের প্রতি নিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে সহজাত হইলেও, উহা সাধনার বস্তু। অভ্যাস ও সংকল্প দ্বারা এই নিষ্ঠা অর্জন করিতে হয়। অধ্যয়ন করিতে হইবে,

অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে, পরীক্ষা থাকিলে পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকার্য হইতে হইবে, এইরূপ সংকল্প মনে থাকা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ সংকল্প থাকিলে মন ক্রমশ পাঠাভ্যাসে অনুরক্ত হইবে। ছাত্রজীবনের প্রথম হইতেই এইরূপ সংকল্প আবশ্যক। একবার শিথিলতা ও আলস্য দ্বারা মন আচ্ছন্ন হইলে আর পরিত্রাণ নাই। এই শৈথিল্য অতিক্রম করিতে বিশেষ প্রচেষ্টা আবশ্যক হয়। বহুদিনের শৈথিল্যের পরেও পুনরায় অধ্যয়নের প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে সহজ ও স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তি সাময়িক বা আকস্মিক কারণে ব্যাহত ছিল বলিয়া পরে সুযোগলাভের সঙ্গে সেই স্বাভাবিক অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষা পুনরায় জাগরূক হইয়াছে।

অধ্যয়ন করিয়া অধীত বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। অধীত বিষয় ভুলিয়া গেলে জ্ঞানলাভ হইবে কিরূপে? কোন বিষয়ই একবার মাত্র অধ্যয়ন করিয়া মনে রাখা যায় না। সেই জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক, সেগুলি পুনঃপুনঃ পড়িতে হয়। শিশু যখন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি শেখে, তখন তাহাকে কতবার ঐগুলি পড়িতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কিছু শিখিতে হইলে পুনঃপুনঃ পাঠ কত প্রয়োজন। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের পঠিতব্য বিষয়ের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইলে এবং স্থায়ীভাবে মনে রাখিতে হইলে বার বার পড়িতে হয়। অনেক সময়ে পাঁচ বার দশ বার হইতে একশত বার বা সহস্র বারও পড়িতে হইতে পারে। এজন্য যে শ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে ঐ সকল দুরূহ বা অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্যক্‌ আয়ত্ত হইবে না।

অধ্যয়নের দ্বারা স্থায়ী জ্ঞানলাভের আর একটি পন্থা লিখন। যে সকল বিষয় ভাল করিয়া অধিগত করিতে হইবে, সেগুলি লিখিয়া ফেলিলে, মনে রাখার পক্ষে এবং সম্যক্ বোধগম্য হইবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। পরীক্ষার পূর্বে এই পন্থা বিশেষ উপকারী। প্রয়োজনীয় বিষয়, কঠিন তথ্য, কঠিন প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রভৃতি লিখিয়া লিখিয়া আয়ত্ত করিলে, ঐগুলি যথাযথ মনে রাখিবার পক্ষে সুবিধা হয়। আমার একজন সহপাঠী এম. এস-সি. পরীক্ষার পূর্বে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় দুই রীম ফুলস্ক্যাপ কাগজ লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। এই পরিশ্রমের পুরস্কারও তিনি পাইয়াছিলেন।

পরীক্ষার বিষয়ই হউক বা অন্য বিষয়ই হউক, একটু গভীরভাবে পাঠ করিবার পক্ষে, কঠিন, প্রয়োজনীয়, নূতন, চিত্তাকর্ষী বিষয়গুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে স্মরণ রাখিবার পক্ষে অনেক সহজ হয়। শুধু তাহাই নহে, অনেক দিন পরে এই খাতাগুলি পাঠ করিয়া বিগত দিনের সাধনার অনেক বিস্মৃত নিদর্শন দেখিয়া মনে আনন্দের সঞ্চার হয়।

ভাষাশিক্ষা

মাতৃভাষাই হউক বা অন্য যে কোন ভাষাই হউক সম্যক্‌রূপে ভাষাশিক্ষা করিতে হইলে নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শিক্ষা করা কর্তব্য। মাতৃভাষার পক্ষে একটু সুবিধা এই যে সাধারণ কথ্য ভাষা জানা থাকে এবং উচ্চারণ শিখিতে কষ্ট হয় না। এই সুবিধা ব্যতীত

মাতৃভাষা শিক্ষাও অন্যান্য ভাষা শিক্ষার মতই শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

ভাষাশিক্ষার প্রথমেই বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর ছোট ছোট সহজ কথাগুলির বানান ও অর্থ শিখিতে হইবে। ইহার পরেই আরম্ভ করিতে হইবে ব্যাকরণ। প্রথমে একখানি সহজ ব্যাকরণ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহাতে ছোট ছোট শব্দ ও সেই সকল শব্দাবলীদ্বারা গঠিত ছোট ছোট বাক্য শেখা ও লেখার অভ্যাস হইবে। ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষাশিক্ষা অসম্ভব। মুখে মুখে শুনিয়া সাধারণ কথ্যভাষা কিয়ৎপরিমাণে শেখা যাইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে না। কেহ প্যারিসে গিয়া কয়েক বৎসর বাস করিলে কোন ফরাসী পুস্তক না পড়িয়াও ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে বা ফরাসী ভাষায় কেহ কথা বলিলে তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাতে ফরাসী ভাষা ভাল করিয়া শেখা হইবে না। ভাল করিয়া শিখিতে হইলে প্রথম হইতে ব্যাকরণ সহযোগে শুদ্ধভাষায় ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে ছোট ও সহজ বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ কঠিনতর বাক্যাবলী পড়িতে ও রচনা করিতে হইবে।

মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদের যে দুইটি অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি, তাহার সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। ব্যাকরণের নিয়মগুলি পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া সম্যক্ অধিগত না হইলে, ভাষাশিক্ষা অসম্ভব। যে কোন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা করা যেমন কঠিন তেমনি শ্রমসাধ্য। সেই জন্য প্রথম প্রথম ব্যাকরণ-বিষয়টি অতিশয় শুষ্ক ও অরুচিকর মনে হয়। কিন্তু কিছুকাল যত্ন ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে করিতে ইহার নীরসতা অনেক কমিয়া যায় এবং পরে আর নীরস বা কঠিন মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকে অনেকেই খুব কঠিন মনে করেন। সম্যক্‌রূপে সমস্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা খুবই কঠিন

সন্দেহ নাই। কথায় আছে, দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ ব্যাকরণং শ্রূয়তে। ব্যাকরণ পড়িতে বার বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা অবশ্য পণ্ডিতের উক্তি। সাধারণ পাঠক প্রত্যেকে ভাষাবিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে, এমন কথা নাই। সাধারণ পাঠক এবং স্কুল কলেজের ছাত্রের পক্ষে যে কোন একটি ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে এবং সাধারণ রচনায় দক্ষ হইতে হইলে চার পাঁচ বৎসর নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন আবশ্যক।

ব্যাকরণের পুস্তক বৎসর বৎসর পরিবর্তন নিতান্ত অন্যায়। প্রথমে একখানি ছোট ব্যাকরণ এবং তারপর একখানি অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাকরণ, ইহা দ্বারাই ব্যাকরণের পাঠ সম্পূর্ণ করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণকৌমুদী' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজির পক্ষেও এই ব্যবস্থা সমীচীন। ব্যাকরণের নিয়ম ও উদাহরণগুলি বার বার পড়িতে পড়িতে মনে স্থায়ী হইয়া যায়। পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করিলেই পূর্ব-অর্জিত ধারণাগুলি নূতন ভাষার ও নূতন উদাহরণের মধ্যে হারাইয়া যায় এবং সমস্ত পুস্তকখানিই আবার নূতন করিয়া পড়িতে হয়। ইহাতে বহু শ্রম এবং বহু সময়ের অপচয় হয়। সুতরাং একখানি ছোট এবং পরে একখানি বড় ব্যাকরণ আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ব্যাকরণকৌমুদী'তে পাণিনি বা মুগ্ধবোধের ভাষা অবিকল রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে তাহা হইলে 'পাণিনিসার' নামক পুস্তকখানি পড়া যাইতে পারে। এই পুস্তকখানি ভাল করিয়া পড়িলেই স্কুল কলেজের ছাত্রদের পক্ষে যে ব্যাকরণজ্ঞান আবশ্যক তাহা মোটামুটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। ইংরাজিতে একখানি প্রাথমিক ব্যাকরণের পর 'নেস্‌ফিল্ডে'র ব্যাকরণখানি ভাল করিয়া

পড়িলে ইংরাজি ভাষা শিখিবার পক্ষে প্রায় যথেষ্ট হইবে। সঙ্গে 'রো'-প্রণীত 'হিন্ট্‌স্' পুস্তকখানিও ইংরাজির বিবিধ প্রকার কথা ও বাক্যাবলী শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হইবে। ব্যাকরণের পুস্তক একবার নির্বাচিত হইলে তাহার আর পরিবর্তন করা কর্তব্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান জন্মিলে পৃথক্ বাংলা ব্যাকরণ প্রায় অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ বাংলা শুদ্ধ শব্দগুলি প্রায় সবই সংস্কৃত শব্দ। উহাদের বানানও সংস্কৃতানুযায়ী। অব্যয়, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি ব্যাপারে বাংলার যে বিশেষত্ব সেগুলি আমরা স্বভাবতই মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের মুখে মুখেই শিখিয়া থাকি। সুতরাং ইহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রকাণ্ড একখানা ব্যাকরণ পড়িবার প্রয়োজন নাই। এমন বহু বাংলা-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ-সাহায্যেই বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের ভাষা সাধারণত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির ভাষা হইতে বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল হইয়া থাকে। বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, প্রভৃতি শিক্ষা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহাদিগকে অবশ্য কলেজের উপরিতন শ্রেণীতে গিয়া এতদ্‌বিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতে হইবে। আমি শুধু ভাষাশিক্ষার কথাই এখানে বলিতেছি।

ভাষাশিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও প্রত্যনুবাদ অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়েও প্রথমে ক্ষুদ্র ও সহজ শব্দ ও বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ কঠিনতর বাক্যাবলী অনুবাদ করিতে হইবে। যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে অপর একটি ভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেই অধিগত ভাষার সাহায্যে নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। যেমন বাংলার সাহায্যে ইংরাজি, ইংরাজির সাহায্যে ফরাসী, ইত্যাদি। এই দুই ভাষার মধ্যে অনুবাদ ও প্রত্যনুবাদ করিতে করিতে নূতন ভাষায় জ্ঞান জন্মিবে। ইংরাজি ভাষা শিখিবার

সময় ইংরাজি হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সংস্কৃত শিখিতে সংস্কৃত হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ অনুবাদ করা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ। বহু ছাত্র এই পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে ভাল করিয়া ভাষাশিক্ষা হইয়া উঠে না।

ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে একটি অবশ্যপালনীয় অভ্যাস হইতেছে, সর্বদা অভিধানের ব্যবহার। এই অভ্যাস বহু ছাত্রের নাই। যে কোন অজানা শব্দ সম্মুখে পড়িলে তৎক্ষণাৎ অভিধান খুলিবে। ইহাতে শুধু যে ঐ কথাটির অর্থ মাত্র জানা যাইবে তাহা নহে, ঐ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বহু শব্দের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হইবে। কাহারও মুখে বা নোট বই হইতে অর্থটি জানিয়া লইলে তাহা মনে রাখা কঠিন। কিন্তু অভিধান খুলিয়া নিজে চেষ্টা করিয়া ঐ শব্দ এবং উহার সম্পর্কিত অন্য শব্দগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, ঐ শব্দ সম্বন্ধে গভীরতর ধারণা জন্মে এবং তাহা স্বভাবতই স্মরণ রাখা সহজ হয়। ভাষাশিক্ষার পক্ষে সর্বদা অভিধান ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

ভাষাশিক্ষার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক কর্তব্য হইতেছে অবিরত অনুশীলন। যে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, সর্বদা সেই ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিছুকাল এই অনুশীলন হইতে বিরত হইলে অনেক কথা, অনেক শব্দ, অনেক ব্যাকরণের নিয়ম, প্রভৃতি ভুল হইয়া যাইবে। বেশিদিন অনুশীলন বন্ধ থাকিলে, পুনরায় শিক্ষা আরম্ভ করিতে আরও অসুবিধা হইবে। অবিরাম অনুশীলন ব্যতীত কোন জ্ঞানই স্থায়ী হয় না। ভাষানুশীলনের পক্ষে এ কথা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য। ছুটির সময়ে, যখন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে, তখন

অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সহিত ভাষাচর্চাও অব্যাহত রাখিতে হইবে। অনুবাদ, প্রত্যনুবাদ, প্রবন্ধরচনা, পত্ররচনা, সারার্থলিখন, প্রভৃতি অবিরামভাবে কিছু কিছু করিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ ভাষাজ্ঞানের উন্নতি হইবে না। ছাত্রাবস্থা শেষ হইবার পরেও কিছু কিছু অনুশীলন না করিলে ভাষাজ্ঞান ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

একসঙ্গে অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিবার প্রচেষ্টা সমীচীন নহে। যদি কাহারও অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে একটি বা দুইটি ভাষার বেশি একসঙ্গে পড়া সংগত হইবে না। এই একটি বা দুইটি ভাষায় কিছুপরিমাণ স্থায়ী জ্ঞান লাভ করিবার পর অপর একটি ভাষা আরম্ভ করা যাইতে পারে। সাধারণ ছাত্রের পক্ষে দুইটি বা তিনটি ভাষাশিক্ষাই যথেষ্ট। যাহাতে ভাল করিয়া লিখিতে, পড়িতে, কথা বলিতে পারা যায়, সেরূপ দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলেই সাধারণত যথেষ্ট মনে করা কর্তব্য। নিজের শক্তি ও সুযোগ অনুসারে ভাষাশিক্ষার চেষ্টা করিবে। নতুবা হঠকারিতাবশত বহু ভাষাবিদ হইতে চেষ্টা করিলে শুধু সময় ও শক্তির অপব্যবহারই হইবে।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমার 'শিক্ষার কথা' পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"সংস্কৃত ভাষার সহিত আমাদের জীবনের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল উপাদান বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, প্রভৃতি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভারতের প্রধান ভাষাগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। বাংলা ভাষার মূলও এই সংস্কৃত ভাষা। বাংলার শব্দসম্ভার প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত।

"ল্যাটিন, গ্রীক, প্রভৃতি ভাষার সহিত ইংরাজির যে সম্পর্ক, সংস্কৃতের সহিত বাংলার সম্পর্ক তদপেক্ষা অনেক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। আমাদের সামাজিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি স্তরে সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও অনুপ্রেরণা পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই প্রভাব, এই অনুপ্রেরণা অপসারিত হইলে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

"শুধু ভাষার কথা বিবেচনা করিলেও দেখিতে পাই, সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল তথ্যগুলি আয়ত্ত হইলে বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য নূতন কোন প্রয়াস করিতে হয় না। সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব, কৃৎ ও তদ্ধিতের সাধারণ নিয়মগুলি আয়ত্ত হইলে বিশুদ্ধ বাংলা শিক্ষা করিতে বেশি আয়াসের প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি অব্যয়, বিশেষণ প্রভৃতি এবং ক্রিয়াপদের প্রচলিত রূপ এবং তৎসহ ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত কতকগুলি শব্দ শিখিলেই বাংলা ভাষা শিখিবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দসম্ভার এবং ইহার মৌলিক প্রক্রিয়া শব্দগঠন। এই দুই বিষয়েই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বাংলাভাষা-শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। সংস্কৃত বাদ দিলে বাংলা-ভাষা-শিক্ষা দুরূহ তো হইবেই, তৎসঙ্গে বাংলা ভাষার বিবিধ অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠিবে। বাংলা ব্যাকরণের মূল ভিত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণ। ব্যাকরণের এই শৃঙ্খল অপসারিত হইলে বাংলা ভাষার মেরুদণ্ড দুর্বল হইয়া পড়িবে।

"সংস্কৃত ভাষা আমাদের জীবনের একটা বিলাসিতা মাত্র নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষুধা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিতে হইলেও আমাদিগকে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের বিবিধ প্রকার ধর্মানুষ্ঠানে যে সকল পৌরাণিক রীতি অবলম্বিত

হইয়া থাকে, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। যে সকল স্তব, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা আমরা পূজা, আরাধনা করিয়া থাকি, সে সকলই সংস্কৃত ভাষায়।

"শিশুর জন্মের পর তাহার নামকরণ করি সংস্কৃত অভিধান হইতে। ইহার পর প্রায় সর্বপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানেই আমরা সংস্কৃত মন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। অবশ্য ইহা না করিয়া সকল মন্ত্রাদি বাংলা ভাষাতেও হয়তো করা যাইতে পারে। এই পন্থার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে। সে আলোচনা আপাতত করিব না। কিন্তু বর্তমান সময়ে এগুলি সংস্কৃত ভাষাতেই হইতেছে এবং মনে হয় আরো বহুকাল এইরূপই চলিবে। সরস্বতী পূজার দিনে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করে—সরস্বত্যৈঃ নমো নমঃ।

"আমাদের সামাজিক জীবনেও সংস্কৃতের প্রভাব অতীব নিবিড়। আমরা গৃহের নাম, পথের নাম, সভ-সমিতির নাম, বিপণির নাম, প্রভৃতি যে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা। আমরা এখনও চিঠিতে লিখি, শ্রীচরণেষু, প্রিয়তমাসু। বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রের শিরোনামায় লিখি, প্রজাপতয়ে নমঃ, আমরা কথায় কথায় বলি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। আমাদের বৃদ্ধেরাই যে শুধু গীতাপাঠ করেন তাহা নহে, নারীরাও বহু স্তব ও স্তোত্র পাঠ ও আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যুগধর্ম যাহাই হউক, নর ও নারীর কর্ম ও কর্তব্য যাহাই হউক, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে এগুলির প্রয়োজনীয়তা কখনই বিলুপ্ত হইবে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

"কেহ কেহ বলেন বাংলা ভাষা সম্যগ্‌রূপে শিখিতে সংস্কৃত শিখিবার

প্রয়োজন নাই। একথা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না। সংস্কৃত বাদ দিলেও বাংলা ব্যাকরণের নামে সংস্কৃত ব্যাকরণই শিখিতে হইবে। নচেৎ, সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে না। ভুজ্ ধাতু হইতে ভুক্ত হয়। অথচ পূজ্ ধাতু হইতে পূক্ত না হইয়া পূজিত কেন হয়, তাহা যে ব্যাকরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে, তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ। আর যদি তাহা না বুঝান হয়, তাহা হইলে, পদে পদে ভুল হইতে থাকিবে। 'শীর্ষ' কথাটির আঠারো প্রকার বানান সম্ভব। ইহার মধ্যে একটি মাত্র শুদ্ধ। অন্যগুলি কেন অশুদ্ধ, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যতীত বোঝা যাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইলে বাংলা ভাষার পরম অবনতি অনিবার্য।

"আর একটি কথা বলিয়া আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করিব। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করিতে হইলে ক্রমশ আমাদিগকে বহু নূতন শব্দ চয়ন ও গঠন করিতে হইবে। নূতন শব্দ গঠিত হয়, ধাতু এবং শব্দের সহিত বিবিধ প্রত্যয় যোগ করিয়া এবং বিবিধ শব্দ সন্ধি সমাসাদি দ্বারা সংযুক্ত করিয়া। এই কার্যে সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সংস্কৃতভাষার শব্দসংখ্যা অগণিত। এই শব্দ-সমুদ্র হইতে সর্বপ্রকার শব্দই সংগৃহীত ও কল্পিত হইতে পারে। বৈষয়িক কার্যে ব্যবহার্য কয়েকটি মাত্র ইংরাজি কথার বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়াই বুঝা গিয়াছে, সংস্কৃত ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

উপরোক্ত কথাগুলি সম্যক্ বিবেচনা করিলে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের মূল উপাদানগুলি শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইবে না। বাংলা-সংস্কৃতের খিচুড়ি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অপেক্ষা খানিকটা খাঁটি সংস্কৃত ব্যাকরণ

পড়ান এবং পরে প্রয়োজনমত কিঞ্চিৎ বাংলা ব্যাকরণ পড়ানই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। সংস্কৃত ব্যাকরণ কথঞ্চিৎ আয়ত্ত হইলে বাংলা ব্যাকরণ পড়িবার প্রয়োজনীয়তা খুবই কমিয়া যায়। আমি অবশ্য ভাষা শিক্ষার কথাই বলিতেছি। ধ্বনিতত্ব ও ভাষাতত্ত্বের কথা বলিতেছি না। সুতরাং বাংলা ভাষা উত্তমরূপে শিখিবার পক্ষেও সংস্কৃত শিখিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।"

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং সনাতন কৃষ্টিগত জীবন লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি বলিলাম। কথাগুলি সকল ছাত্র ও শিক্ষকবর্গেরই প্রণিধানযোগ্য। বৈষয়িক প্রয়োজনে সংস্কৃত, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষা কখন, কোথায়, কতদূর অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে আলোচনা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অবান্তর। তাহারা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম যথাযথ পালন করিবে, ইহাই প্রধান কথা।

গণিত-শিক্ষা

গণিত ব্যতীত সংসার এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। প্রাতঃকাল হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সর্বদাই আমরা গণিতের শরণ লইতেছি। অথচ গণিতের প্রতি বহু ছাত্রের একটি অকারণ ভীতি আছে। তাহারা গণিতকে শুষ্ক ও কঠিন বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই। অন্যান্য বিষয়

অধ্যয়ন করিতে যেরূপ শ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হয়, ইহার জন্য তাহা অপেক্ষা বেশি শ্রম করিতে হয় না।

গণিতের প্রতি ভীতি বা গণিতকে কঠিন মনে করা, ইহার একটি কারণ এই যে গণিত একটি ধারাবাহিক পঠিতব্য বিষয়। একাদিক্রমে একটির পর একটি বিষয় ভাল করিয়া অধিগত করিতে হয়। ভূগোলে যেমন 'ভারতবর্ষ' না পড়িয়াও 'আফ্রিকা' পড়া যায়, গণিতে তাহা যায় না। যোগ না শিখিয়া বিয়োগ শেখা যায় না, যোগ-বিয়োগ না শিখিয়া গুণ-ভাগ শেখা যায় না। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ না শিখিয়া ল. সা. গু., গ. সা. গু শেখা যায় না। ল. সা. গু., গ. সা. গু. না শিখিয়া ভগ্নাংশ শেখা যায় না। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও ছেদ পড়িলে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য যেটুকুই পড়া হউক বা শেখা হউক, সেটুকু ধারাবাহিকভাবে এবং গভীরভাবে শিখিতে হইবে। ছাত্রেরা সব সময়ে তাহা করে না, বা তাহাদিগকে করান হয় না। সেই জন্য এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও অমনোযোগ বা শৈথিল্যের জন্য যে ত্রুটি থাকিয়া যায়, তাহা সহজে নিরাকৃত হয় না। যে ল. সা. গু. ও গ. সা. গু ভাল করিয়া শেখে নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী কোন কিছুই ভাল করিয়া বোধগম্য হইবে না। সবই কঠিন মনে হইবে।

গণিত কঠিন মনে করিবার আর একটি কারণ এই, যে গণিতে অর্ধসত্যের স্থান নাই। কোন প্রশ্নের উত্তর হয় ভুল, না হয় নির্ভুল। মাঝামাঝি ব্যবস্থা নাই। ইহা অবশ্য আমাদের পাঠন এবং পরীক্ষার রীতির উপরও কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। গণিতের মূলতত্ত্ব বুঝিয়া থাকিলে সাময়িক অনবধানতাবশত যে ভুল, তাহাকে গুরুতর ভুল মনে করা সমীচীন নহে। কিন্তু কার্যত আমরা তাহাই করি। গণিত

যে শুধু আকস্মিক ভুলভ্রান্তির উপর নির্ভর করে না, উহার মূলতত্ত্বই প্রধান, কোন বিশেষ অঙ্ক কষিতে গিয়া সাময়িক সামান্য ত্রুটিকে (Slip) গুরুতর মনে করা অসমীচীন, এই ধারণা ছাত্রের মনে বদ্ধমূল হইলে গণিতের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

মনকে একাগ্র করিতে, বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংহত করিতে, মস্তিষ্কের সুশৃঙ্খল পরিচালনা করিতে, সূক্ষ্ম চিন্তার অভ্যাস করিতে গণিতের প্রভাব অপরিসীম। গণিতের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার কোনই কারণ নাই। শুধু উপরে উল্লিখিত বিষয় দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই গণিতশিক্ষা সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

গণিতের প্রশ্নসমূহের সমাধান যথাসম্ভব নিজেই করিবার চেষ্টা করিবে। শিক্ষকেরা যতই সাহায্য করুন, নিজের প্রচেষ্টা ব্যতীত গণিতের তত্ত্বগুলি সম্যক আয়ত্ত করা যাইবে না। অনেক বিষয় আছে, যেগুলি অন্যের মুখে শুনিয়াও কিয়ৎপরিমাণে বা বহুলপরিমাণে বোধগম্য হয়। কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত নিজস্ব চেষ্টা না থাকিলে গণিতে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে, গণিত শিক্ষা করিতে হইলে বিশেষরূপে বুদ্ধিমান হওয়া আবশ্যক। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক স্থলেই দেখা যাইবে, বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ হইলেও মনোযোগিতার তারতম্য হেতু গণিতের প্রতি আকর্ষণের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহারা বেশি মনোযোগী, বেশি একাগ্রচিত্ত, তাহারা গণিতকে কঠিন মনে করে না। মনোযোগ এবং একাগ্রচিত্ততা বেশি হইলেই যে বুদ্ধি বেশি হইবে, তাহা নহে। যে ছাত্র সত্য সত্যই অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা বুদ্ধিমান, সেও যদি মনোযোগী ছাত্র না হয়, তাহা হইলে শুধু বুদ্ধির বলে গণিতে পারদর্শী হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যহেতু যে পার্থক্য

তাহা শুধু গণিতের পক্ষে নহে, সকল বিষয়ের পক্ষেই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠস্থকরণ

ছাত্রগণের পক্ষে কণ্ঠস্থকরণ এবং কণ্ঠস্থকরণের শক্তি একটি মহৎ গুণ। বহুপ্রকার পঠনীয় বিষয় আছে, যাহা কণ্ঠস্থ না করিলে শিক্ষা করা যায় না।

যে কোন্ ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে উহার বর্ণাবলী, শব্দ ও বিবিধ প্রকার শব্দসমষ্টি (phrase) ও বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দগুচ্ছ (idioms) কণ্ঠস্থ করিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়ম ও উদাহরণ কণ্ঠস্থ করিতে হয়। সন্ধি, সমাস, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগাদি সম্পর্কে বহু নিয়ম কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন। ধাতুরূপ, শব্দরূপ, প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে শৈথিল্য করিলে ভাষা শিক্ষা করা যায় না। শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে কোন প্রকার অধ্যয়নই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 'Be' এর অতীত কালে যে 'was' হইবে তাহা কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, যাহারা ভাষাবিৎ বা যে সকল ছাত্রের ভাষাজ্ঞান প্রখর, তাহারা সকলেই বহু বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে অভ্যস্ত।

শুধু বৈয়াকরণিক ব্যাপারে নহে, অন্যপ্রকার ভাষাচর্চায়ও কণ্ঠস্থকরণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। যে সকল ছাত্রেরা সুন্দর সুন্দর কবিতা বা গদ্যরচনা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, তাহাদের নিজেদের রচনাও উন্নত হয়।

যে শুধু আকস্মিক ভুলভ্রান্তির উপর নির্ভর করে না, উহার মূলতত্ত্বই প্রধান, কোন বিশেষ অঙ্ক কষিতে গিয়া সাময়িক সামান্য ত্রুটিকে (Slip) গুরুতর মনে করা অসমীচীন, এই ধারণা ছাত্রের মনে বদ্ধমূল হইলে গণিতের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

মনকে একাগ্র করিতে, বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংহত করিতে, মস্তিষ্কের সুশৃঙ্খল পরিচালনা করিতে, সূক্ষ্ম চিন্তার অভ্যাস করিতে গণিতের প্রভাব অপরিসীম। গণিতের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার কোনই কারণ নাই। শুধু উপরে উল্লিখিত বিষয় দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই গণিতশিক্ষা সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

গণিতের প্রশ্নসমূহের সমাধান যথাসম্ভব নিজেই করিবার চেষ্টা করিবে। শিক্ষকেরা যতই সাহায্য করুন, নিজের প্রচেষ্টা ব্যতীত গণিতের তত্ত্বগুলি সম্যক আয়ত্ত করা যাইবে না। অনেক বিষয় আছে, যেগুলি অন্যের মুখে শুনিয়াও কিয়ৎপরিমাণে বা বহুলপরিমাণে বোধগম্য হয়। কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত নিজস্ব চেষ্টা না থাকিলে গণিতে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে, গণিত শিক্ষা করিতে হইলে বিশেষরূপে বুদ্ধিমান হওয়া আবশ্যক। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক স্থলেই দেখা যাইবে, বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ হইলেও মনোযোগিতার তারতম্য হেতু গণিতের প্রতি আকর্ষণের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহারা বেশি মনোযোগী, বেশি একাগ্রচিত্ত, তাহারা গণিতকে কঠিন মনে করে না। মনোযোগ এবং একাগ্রচিত্ততা বেশি হইলেই যে বুদ্ধি বেশি হইবে, তাহা নহে। যে ছাত্র সত্য সত্যই অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা বুদ্ধিমান, সেও যদি মনোযোগী ছাত্র না হয়, তাহা হইলে শুধু বুদ্ধির বলে গণিতে পারদর্শী হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যহেতু যে পার্থক্য

তাহা শুধু গণিতের পক্ষে নহে, সকল বিষয়ের পক্ষেই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠস্থকরণ

ছাত্রগণের পক্ষে কণ্ঠস্থকরণ এবং কণ্ঠস্থকরণের শক্তি একটি মহৎ গুণ। বহুপ্রকার পঠনীয় বিষয় আছে, যাহা কণ্ঠস্থ না করিলে শিক্ষা করা যায় না।

যে কোন্ ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে উহার বর্ণাবলী, শব্দ ও বিবিধ প্রকার শব্দসমষ্টি (phrase) ও বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দগুচ্ছ (idioms) কণ্ঠস্থ করিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়ম ও উদাহরণ কণ্ঠস্থ করিতে হয়। সন্ধি, সমাস, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগাদি সম্পর্কে বহু নিয়ম কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন। ধাতুরূপ, শব্দরূপ, প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে শৈথিল্য করিলে ভাষা শিক্ষা করা যায় না। শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে কোন প্রকার অধ্যয়নই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 'Be' এর অতীত কালে যে 'was' হইবে তাহা কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, যাহারা ভাষাবিৎ বা যে সকল ছাত্রের ভাষাজ্ঞান প্রখর, তাহারা সকলেই বহু বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে অভ্যস্ত।

শুধু বৈয়াকরণিক ব্যাপারে নহে, অন্যপ্রকার ভাষাচর্চায়ও কণ্ঠস্থ-করণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। যে সকল ছাত্রেরা সুন্দর সুন্দর কবিতা বা গদ্যরচনা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, তাহাদের নিজেদের রচনাও উন্নত হয়।

শব্দাবলী ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী কণ্ঠস্থ থাকিলে যেমন ভাষা জ্ঞানের উন্নতি হয়, তেমনি উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনা কণ্ঠস্থ করিলেও সুন্দর ও মধুর শব্দ ও বাক্যনির্ধারণে প্রভূতপরিমাণে সহায়তা হয়। এতদ্‌ব্যতীত কীর্তিমান লেখকগণের রচনা কণ্ঠস্থ করায় এবং আবৃত্তি করায় নিজের এবং অপরের আনন্দ ও তৃপ্তি হইয়া থাকে। সকল ছাত্রেরই কর্তব্য উৎকৃষ্ট লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনাবলী হইতে বিবিধ রচনা কণ্ঠস্থ করা। ইহাতে ঐ সকল রচনার অন্তর্গত সুন্দর শব্দ, বাক্য এবং ভাবগুলি অতি সহজে আয়ত্ত হইবে এবং সর্বদা স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

শুধু ভাষাশিক্ষার জন্য নহে, অন্যান্য অধীতব্য বিষয়েও বহু স্থলে কণ্ঠস্থকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। গণিত অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রথমেই শতকিয়া এবং পরে নামতা মুখস্থ করিতে হয়। তারপর টাকা-আনা-পাই-এর সম্বন্ধ, মন-সের-ছটাক-তোলা প্রভৃতির সম্পর্ক, মাইল-গজ-ফুট-ইঞ্চি প্রভৃতির সম্পর্ক, বিঘা-কাঠা-ছটাক, প্রভৃতির সম্পর্ক, এ সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। বর্তমান কালে, এই সকল ব্যতীত, টাকা-নয়া পয়সা, গ্রাম-কিলোগ্রাম, প্রভৃতি নবপ্রচলিত মুদ্রার ও ওজনের তালিকা কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। যে ইহা করিবে না বা ইহা করিতে আলস্যবোধ করিবে, সে গণিত শিক্ষা করিতে পারিবে না। ভূগোল শিক্ষা করিতে দেশ মহাদেশের নাম, নদী, পর্বত, হ্রদ, প্রভৃতির নাম, প্রদেশ, নগর প্রভৃতির নাম, প্রভৃতি বহু তথ্য কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। ইতিহাস পড়িতে গেলে রাজ্য সাম্রাজ্যের নাম, রাজা ও সম্রাট প্রভৃতির নাম, যুদ্ধবিগ্রহের সময়, প্রভৃতি বহু বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হইবে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, অধ্যয়নের সকল বিষয়ের মধ্যেই বহু কণ্ঠস্থ করিবার বস্তু রহিয়াছে। যে ছাত্র আলস্যবশত এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে শৈথিল্য করিবে, তাহাকেই ইহার ফল-

ভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ বা সুষ্ঠু হইবে না।

কণ্ঠস্থ করিবার একমাত্র উপায় বার বার অধ্যয়ন। একই কথা, একই বাক্যাবলী বার বার উচ্চারণ করিলে উহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। বার বার উচ্চারণ করিবার সময়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সহিত উচ্চারণ করিবে। উচ্চারণ করিবার সময়ে বেশি জোরে বা চিৎকার করিয়া পড়িবে না। তাহাতে মনঃসংযোগ হ্রাস পাইবে এবং ফুসফুসের পরিশ্রম বেশি হইবে। যদি নিকটে কোন ছাত্র থাকে, তবে তাহারও পড়ার ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং ধীরে ধীরে আবৃত্তি করাই সংগত। বার বার পড়িয়া কথাগুলি কণ্ঠস্থ হইয়া গেলে কিছুদিন পর পর পুনরায় উহার আবৃত্তি করিবে। নচেৎ কণ্ঠস্থ বিষয় বেশি দিন মনে থাকিবে না। কিছুদিন ধরিয়া বার বার কণ্ঠস্থ বিষয় আবৃত্তি করিলে উহা মানসপটে স্থায়ী হইয়া যায়। পরে আর সহজে ভুল হয় না। যেমন, চার পাঁচে কুড়ি। ইহা আমাদের এমনভাবে কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলেও ইহা ভুলিতে পারিব না। এইরূপ ভুলিতে না পারার একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ৺পিতৃদেবের নিকট হইতে একটি উদ্ভট শ্লোক (অর্থাৎ যে শ্লোক কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নয়) শিখিয়াছিলাম, সেটি এখনও আমার মনে আছে—

বার্চারেড়্ ধ্বজধগ্ধ্বতোড়্বধিপতিঃ ফুগ্রেড়্ জজানির্গণেড়
গোরাড়ারুড়ুরঃ সরেড়ুরুতরগ্রৈবেয়কভ্রাড়রম্।
উত্থদ্দৃঙ্ নরকাস্থিধৃক্ ত্রিদৃগিভেড়াদ্রাজিনৈঃ সচ্ছবিঃ
সোৎস্তাদস্মুমদস্মুদালিগলরুগ্দেবো মুদে বো মৃড়ঃ॥

এই শ্লোকে মহাদেবকে স্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বহু কবি ও সাহিত্যিকের রচনা হইতে বহু প্রকার রচনা আবৃত্তি করিতে পারেন। অনাবশ্যকভাবে বিবিধ অবান্তর

বিষয়ের আবৃত্তি বা কণ্ঠস্থকরণে সময়ের বৃথা অপচয় হয়। তবে পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে বহু প্রয়োজনীয় স্থলে কণ্ঠস্থকরণে অধীতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে এবং সেই জ্ঞান মনে করিয়া রাখিতে সুবিধা হয়।

বহু ব্যক্তির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি থাকে। শুনিয়াছি, সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ বলিতে পারেন এমন ব্যক্তিও আছেন। চেষ্টা করিয়া অসাধারণত্বলাভ করা সহজ বা সম্ভব নহে। তবে ঐকান্তিকতার সহিত পরিশ্রম করিলে সকল ছাত্রই নিজ নিজ অধীতব্য বিষয়ের অন্তর্গত বহু বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে পারে এবং সেই কণ্ঠস্থ বিদ্যা প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করিতে পারে।

একটা কথা আছে, আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী। কথাটি আপাতত তুচ্ছ বা নিরর্থক মনে হইলেও ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। কোন বিষয় পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করিলে এবং তাহা কণ্ঠস্থ করিলে ঐ কণ্ঠস্থ বিষয়ের অন্তর্গত শব্দ, বাক্য, প্রভৃতি মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উহাদের অন্তর্নিহিত অর্থও বোধগম্য হইতে থাকে।

ছাত্রাবস্থাই আবৃত্তি ও কণ্ঠস্থকরণের অভ্যাস অর্জনের প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়েই স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে এবং শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বহু বিষয় কণ্ঠস্থ করা যায়। কণ্ঠস্থবিদ্যার একটি মহৎ গুণ এই যে বহু বিস্মৃত বিষয়, বহু কঠিন বিষয়, বহু গভীর তত্ত্ব কণ্ঠস্থবিষয়ের দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব হয়। একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিতেছি। আমাকে একদিন একটি বালক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কপাট' মানে কি ? সহসা অর্থটি বলিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই বাল্যকালের পঠিত একটি শ্লোক মনে পড়িয়া গেল—

আপিঙ্গরুক্ষোর্ধ্বশিরস্থবালৈঃ
শিরালজঙ্ঘৈর্গিরিকূটদঘ্নৈঃ ॥
ততঃ ক্ষপাটৈঃ পৃথুপিঙ্গলাক্ষৈঃ
খং প্রাবৃষেণ্যৈরিব চানশেহব্দৈঃ ॥

এই শ্লোকটির অর্থ মনে পড়িতেই 'ক্ষপাট' কথাটির অর্থ যে 'রাক্ষস', তাহা মনে পড়িয়া গেল। এইরূপে যাঁহাদের শেক্স্পীয়র, মিলটন, মধুসূদন প্রভৃতির রচনা কণ্ঠস্থ আছে, তাঁহারা তদন্তর্গত বহু শব্দ, বাক্য, প্রভৃতির অর্থ সহজে মনে করিয়া রাখিতে পারেন।

আমার নিজের কণ্ঠস্থকরণের শক্তি খুব বেশি ছিল না। সেই জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ছাত্রগণকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কণ্ঠস্থ করিতে যে সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় বহুগুণে অধিক উপকার হয়। এজন্য সময়-ব্যয়কে কখনই অপব্যয় মনে করিবে না। ছাত্রের পক্ষে কণ্ঠস্থকরণশক্তি একটি মহৎ গুণ।

স্বাবলম্বন

যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই স্বাবলম্বন একটি অপরিহার্য গুণ। এই গুণ না থাকিলে কেহই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়নবিষয়ে স্বাবলম্বন একান্ত আবশ্যক। এখানে স্বাবলম্বন বলিতে আমি আর্থিক অবলম্বনের কথা বলিতেছি না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন ছাত্রকেই আমি অর্থোপার্জনের উপদেশ দিব

না। ছাত্রজীবন অর্থোপার্জনের সময় নহে। স্বাস্থ্যোন্নতি চরিত্রোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতি ব্যতীত ছাত্রের আর কোন গুরুতর কর্তব্য নাই।

সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া অধ্যয়ন বা জ্ঞানার্জন অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রকে শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে। শিক্ষক বা গুরুরূপ জ্ঞানের অগ্নি হইতে ছাত্রগণ নিজের মনে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিবে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে শিক্ষালাভ বা জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নিজস্ব ব্যাপার। বাহির হইতে যিনিই যে সাহায্য করুন, নিজের মনে তাহা গ্রহণ করা এবং রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। অর্থ যেমন অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, সাংসারিক অন্যপ্রকার বহু দ্রব্য যেমন অপরের দ্বারা সংগৃহীত হওয়া সম্ভব, জ্ঞানলাভ সেরূপে সম্ভব নহে। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, নিজে পরিশ্রম করিতে হইবে, নিজে পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে, নিজে সমস্ত বিষয়ের অর্থগ্রহণ ও মর্মগ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষকের সহায়তা পাইলেও শুধু সেই সহায়তার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

আমাদের ছাত্রদের পক্ষে স্বাবলম্বী হইবার কতকগুলি বাধা আছে। যেমন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে যতখানি সুষ্ঠুভাবে এবং ব্যক্তিগত-ভাবে পড়ান আবশ্যক, ছাত্রসংখ্যার আধিক্যহেতু তাহা পারেন না। এবং এই কারণেই ছাত্রেরা বাল্যকাল হইতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত অন্যপ্রকার সহায়তা লইতে বাধ্য হয়। এই সহায়তার দুইটি স্পষ্ট রূপ আছে। একটি হইতেছে অর্থপুস্তক এবং অপরটি হইতেছে গৃহশিক্ষক।

অর্থপুস্তকের প্রতি অনেকেরই বিরাগ আছে। কিন্তু অর্থপুস্তকে যে সকল বিষয় ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়, তাহা কোন শিক্ষকের নিকট পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রেরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকগণের সহায়তা পায় না। শিক্ষকগণেরও এমন সময় নাই যে

কোন ছাত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় পড়ান। সুতরাং অর্থপুস্তকের সহায়তা লওয়া একেবারে অবাঞ্ছনীয় নয়। তবে ভাল করিয়া না বুঝিয়া শুধু কতকগুলি বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা অবশ্য অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। নচেৎ ভাল করিয়া পড়িলে অর্থপুস্তকের মধ্যে বহু মূল্যবান পঠিতব্য বিষয় পাওয়া যাইবে। অর্থপুস্তকও অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মতই জ্ঞানার্জনের উপায়রূপেই ব্যবহার কবিবে। শুধু কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান কণ্ঠস্থ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। আমার মনে আছে, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য মহাশয়গণের সংস্কৃত পুস্তকের অর্থপুস্তক হইতে ব্যাকরণের বহু সূত্র এবং বিবিধ প্রয়োগ বিষয়ে বহু শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। সেই সকল তথ্য আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণের মধ্যে পাওয়া যাইত না। এইরূপ, ইংরাজি পুস্তকের অর্থপুস্তকের মধ্যে অনেক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং অনেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিচয় (allusion, reference, ইত্যাদি) থাকে। এগুলি সব সময়ে ছাত্রেরা শিক্ষকগণের নিকট পায় না। সুতরাং অর্থপুস্তকগুলি একেবারে নিরর্থক নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল পুস্তকেরই বিখ্যাত পণ্ডিতগণের টীকা আছে। সেগুলি শুধু যে অনাবশ্যক নহে, তাহা নহে। সেগুলি ব্যতীত মূল পুস্তকের অর্থগ্রহণ এবং মর্মগ্রহণ সম্ভব নয়। কোন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষেই নিজের ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল টীকার স্থান পূর্ণ করা সম্ভব নয়। অনেক স্থলে টীকারও আবার ভাষ্য আছে। অর্থাৎ টীকাগুলিও এমন দুরূহ তথ্যে পরিপূর্ণ যে, আর একটি সরল ভাষ্য ব্যতীত তাহাদের অর্থ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং অর্থপুস্তকমাত্রই যে নিন্দনীয় তাহা কখনও হইতে পারে না। তবে অর্থপুস্তক পড়িতে হইবে পুস্তকের মত, শুধু ফাঁকি দিয়া পরীক্ষার নম্বর সংগ্রহের জন্য নহে।

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাও কতকটা অর্থপুস্তকেরই মত। বর্তমান যুগের শিক্ষার হাটের হট্টগোলের মধ্যে সাধারণ ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট যথেষ্ট সহায়তা পায় না। এই জন্য তাহাদের জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা ব্যয়সঙ্কুল বলিয়া সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না। সম্ভব হইলেও এই ব্যবস্থা অনেক সময়ে ছাত্রকে অত্যধিক পরিমাণে পরমুখাপেক্ষী করিয়া ফেলে। বিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে কোন সময়েই ছাত্র নিজে মনোযোগ সহকারে পড়িবার সুযোগ পায় না। ফলে তাহার নিজস্ব চেষ্টা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। অনেক সময় ছাত্রদের এমন কদভ্যাস হইয়া যায় যে, শিক্ষক পাশে বসিয়া না থাকিলে বা অবিরত উপদেশ না দিলে তাহারা কিছুই পড়িতে বা শিখিতে চায় না। এইরূপ অভ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক। অধ্যয়ন যে সম্পূর্ণ নিজস্ব কর্তব্য তাহা ইহারা ভুলিয়া যায়। ইহারা কখনই উত্তম ছাত্র হইতে পারে না। গৃহেই হউক বা বিদ্যালয়েই হউক, শিক্ষকগণের সহায়তা লইবে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এবং অসহায়-ভাবে উঁহাদের প্রতি নির্ভরশীল হইবে না।

অধ্যয়ন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হইবে। নিজের পড়িবার ঘরটি নিজ হাতে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে এবং বই, খাতা, টেবিল, চেয়ার, শেল্ফ্ প্রভৃতি ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিবে। বাড়ীতেই হউক বা হোস্টেলেই হউক, এই সকল বিষয়ে চাকর বা মা বা দাদা দিদিদের উপর নির্ভর করিবে না। নিজের গেঞ্জি, রুমাল, গামছা, প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষগুলি নিজ হাতে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবে। শুধু ধোপার উপর বা চাকরের উপর নির্ভর করিবে না। সময় নষ্ট করিবার অজুহাত চলিবে না। এই সকল কাজে মোটেই বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

জীবনের সকল প্রকার সৎ এবং উচ্চ চিন্তা ও অভ্যাস আয়ত্ত করিবার পক্ষে ছাত্রজীবনই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে অভ্যস্ত হইলে, এই অভ্যাস পরবর্তী জীবনেও শুভফল-প্রসূ হইবে।

পৃথিবীর সকল মহৎ ব্যক্তিই বাল্যকাল হইতেই স্বাবলম্বী ছিলেন। নিজের প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজে করিলে শুধু যে কাজগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় এবং অনেক স্থলে ব্যয়সংক্ষেপ হয়, তাহা নহে, ইহাতে একটা মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। নিজের জুতা নিজেই পরিষ্কার করিবে এবং তাহাতে কালি লাগাইবে। জামার বোতাম ভাঙিয়া গেলে বা পড়িয়া গেলে নিজেই তাহা বসাইয়া লইবে। অন্যের অপেক্ষায় থাকিবে না। ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে যত বেশি স্বাবলম্বী হইবে, ততই প্রত্যেক বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় বাড়িবে, আলস্য কমিবে, এবং নিজের কর্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে।

মিতব্যয়িতা

ছাত্রজীবন হইতে সকল বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে অভাস করা কর্তব্য। মিতব্যয়িতা এবং কৃপণতা এক বস্তু নহে। আবশ্যক বিষয়েও অর্থব্যয় না করাই কৃপণতা। অনাবশ্যক বিষয়ে অর্থব্যয় না করাকে মিতব্যয়িতা বলা যায়। অবশ্য প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের সীমারেখা নির্দেশ সব সময়ে সহজ নয়। তপাপি অনেক স্থলেই আমরা বুঝিতে পারি যে কোন কোন বিষয়ে অর্থব্যয় করা সমীচীন নহে, অথচ অমিতব্যয়িতার

অভ্যাসবশত অনেক ব্যয় হইয়া যায়। এই সকল স্থলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

ছাত্রদিগকেও কিছু কিছু ব্যয় নিজহাতে করিতে হয়। বাড়ীতে থাকিলে অবশ্য তাহার পক্ষে অমিতব্যয়ী হইবার সুযোগ বা আশঙ্কা খুবই কম। তথাপি অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহারা অনাবশ্যক ব্যয়ের জন্য পিতামাতাকে বিরক্ত করিয়া থাকে। এরূপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। হোস্টেলে থাকিলে নিজে ব্যয় করিবার সুযোগ কিছু বেশি হয়, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার পক্ষে অমিতব্যয়ী হইবার উপায় খুব বেশি থাকে না। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, ধনী পিতার পুত্রেরা হোস্টেলে গিয়া নানা অজুহাতে পিতার নিকট হইতে অধিক অর্থ চাহিয়া আনে, এবং বিবিধ প্রকারে তাহার অপব্যয় করে। এই সকল স্থলে ছাত্রদের পিতা বা অভিভাবকগণেরও অনেকটা দায়িত্ব আছে। তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণ প্রশ্রয় না পাইলে তাহারা এরূপ করিতে পারে না। অত্যধিক স্নেহবশত পিতারা ভুলিয়া যান যে পুত্রেরা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ পাইলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং অভিভাবকগণের কর্তব্য, অতিরিক্ত অর্থ ছাত্রগণের হাতে না দেওয়া এবং ছাত্রগণেরও কর্তব্য অভিভাবকগণের নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ না চাওয়া।

মিতব্যয়িতা একটি অভ্যাস। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বহু স্থলে মিতব্যয়িতাও আবার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া কৃপণতায় পরিণত হয়। কৃপণতা অতি কদর্য অভ্যাস। ইহা চরম স্বার্থপরতার একটি বাহ্য প্রকাশ। অমিতব্যয়িতা দোষের হইলেও উহার মধ্যে মনের প্রসার ও ঔদার্যের একটা প্রভা থাকে, কিন্তু কৃপণতা মনুষ্যত্ববিনাশী। পৃথিবীর কোন মহৎ ব্যক্তি কৃপণ ছিলেন, এরূপ

সংবাদ কেহ জানে না। কিন্তু বহু মহৎ ব্যক্তিই অমিতব্যয়ী ছিলেন, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে অমিতব্যয়ী হইলেই মহৎ হওয়া যাইবে। সংসারে সকল বিষয়েই অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক। অর্থবিষয়ে সাবধানতাকেই মিতব্যয়িতা বলিতে পারা যায়। এই সাবধানতারও সীমা আছে। তাহা অতিক্রম করিলে মন পঙ্গু হইয়া যায়।

ছাত্রেরা সর্বদা মনে রাখিবে যে তাহাদের অভ্যাসের মধ্যে যেন কোন প্রকার আতিশয্য না থাকে। মিতব্যয়িতার মূলসূত্র এই যে আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হইবে, কখনো বেশি হইবে না। তোমরা পিতামাতার নিকট হইতে নিজ প্রয়োজনানুসারে অর্থ চাহিবে। তাঁহারাও সাধ্যমত তাহা দিতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা যাহা দেন, নিজের ব্যয় যাহাতে তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহার চেষ্টা করিবে।

বিশেষ কোন দুর্ঘটনা বা আপদ বিপদ বা অসুখের চিকিৎসা প্রভৃতি কারণ ব্যতীত কোন কারণেই ধার করিবে না। ধার করার অভ্যাস অতিশয় মন্দ। নিজের সামর্থ্যের বাহিরে কখনও কোন খরচ করিবে না। এই অভ্যাস ছাত্রজীবন হইতেই অর্জন করিবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস অব্যাহত থাকিবে।

আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখিবার অভ্যাস সংযমের পরিচায়ক। স্কুল কলেজের বেতন, হোস্টেলের দেয় টাকা, প্রভৃতি খরচ বাঁধা খরচ। এগুলি কমবেশি করা যায় না। সুতরাং ছাত্রদের পক্ষে মিতব্যয়িতার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। তথাপি, যে সকল ছাত্রের অভিভাবক ধনী, তাহারা নানা অজুহাতে বেশি অর্থ আনিয়া বেশভূষা, অতিরিক্ত টিফিন খাওয়া, সিনেমা দেখা, বন্ধুবান্ধবের জন্য খরচ করা, প্রভৃতি উপায়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস ভাল নহে। নিজের

নিয়মিত প্রয়োজন ব্যতীত অধিক অর্থ অভিভাবকগণের নিকট চাওয়া বা তাহা নানাভাবে ব্যয় করার অভ্যাস সর্বদা পরিহার করিবে।

আলস্য

ছাত্রজীবনের সর্বপ্রধান শত্রু আলস্য। এই শত্রু যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং পরাভূত করিয়াছে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়নাদি যে সকল কর্তব্য কর্ম আছে, তাহা সম্যক্ রূপে পালন করিতে যে শ্রম আবশ্যক, তাহা হইতে কখনই বিন্দুমাত্র বিমুখ হইবে না। প্রাতে সময়মত গাত্রোত্থান না করা আলস্যেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া এবং পরবর্তী দৈনন্দিন কর্মে শিথিলতা, ইহাও আলস্যের লক্ষণ। আলস্যের একটি মূল প্রকৃতিই এই যে ইহাকে কিঞ্চিন্মাত্র প্রশ্রয় দিলেই ইহা ক্রমশ ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিয়া সমগ্র জীবনকেই গ্রাস করিয়া ফেলে। সেইজন্য এই শত্রুকে কখনই কোনমতেই প্রশ্রয় দিবে না।

যখন যে কর্তব্য করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিবে। অনেক সময়ে অধীতব্য বিষয় কঠিন মনে হইলে মনে অনিচ্ছা ও আলস্যের উদয় হয়, আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে না। তখন এই বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবে। যখন পুনরায় মনে উৎসাহ আসে বা ইতিমধ্যে যদি শিক্ষক বা অন্য কাহারও সহায়তায় কঠিন বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইয়া থাকে, তখন পুনরায় সেই পরিত্যক্ত

বিষয় পড়িবে। কোন বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হইলে একাদিক্রমে বহুক্ষণ শ্রম করিতে হয়। ইহা হইতে বিমুখ হইলে চলিবে না। কণ্ঠস্থকরণ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য অনেক সময়ে কণ্ঠস্থকরণকে আলস্য-নিবারণের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শুধু কণ্ঠস্থকরণ নহে, যে কোন বিষয় মনে রাখিতে হইলে বারংবার পঠন অত্যাবশ্যক। বারংবার পঠনের অর্থই হইতেছে পরিশ্রম। পরিশ্রমকাতরতাই আলস্য। সুতরাং আলস্যের বশবর্তী হইলে কোন অধ্যয়নই সুষ্ঠুরূপে করা যাইবে না। কোন বিষয় একাদিক্রমে বহুক্ষণ ধরিয়া অধ্যয়ন না করিলে ঐ বিষয়ে যথাযথরূপে অগ্রসর হওয়া যায় না। আলস্য পরিত্যাগ না করিলে একাগ্র চিত্তে বহুক্ষণ অধ্যয়ন করা যায় না। গণিতের কোন প্রশ্নমালা ধরিয়া একাদিক্রমে বহু প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বহু শ্রম আবশ্যক। আলস্য করিলে এই কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। অল্প একটু পড়িয়া, যাহা বহুবার পড়া আবশ্যক তাহা দুই একবার পড়িয়া, যে প্রশ্নমালার বহু প্রশ্ন সমাধান আবশ্যক, তাহা হইতে অল্প কয়েকটি করিয়া, কোনমতে কর্তব্য সারিবার চেষ্টা আলস্যেরই লক্ষণ। আলস্যপরায়ণ ছাত্রেরা শিক্ষককে এবং অভিভাবকগণকে অনেক সময়ে এইরূপে প্রতারণা করিয়া থাকে। অধ্যয়নের ভান করিয়া মনোযোগ ও শ্রম সহকারে অধ্যয়ন করে না। ইহাতে যে নিজেকেই ভয়ানকভাবে প্রতারিত করা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। বিদ্যালয় খোলা থাকিলে প্রতিদিন অন্তত ছয় ঘণ্টা এবং বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে প্রতিদিন অন্তত নয় ঘণ্টা অধ্যয়ন আবশ্যক। তবে বাড়ীতে থাকিলে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় সাংসারিক কাজের জন্য কিছু অনিয়ম হইতে পারে। হোস্টেলে থাকিলে এইরূপ অনিয়ম হইবার কোন কারণ নাই। প্রতিদিন কতখানি পড়িবার কথা এবং কার্যত কতখানি পড়া হইল, তাহার একটি হিসাব রাখিতে

পারিলে ভাল হয়। প্রতিদিন প্রাতে পূর্বদিনের কার্যের একটি হিসাব অন্তত মনে মনে করিয়া লইলে বর্তমান দিনের কার্যারম্ভের পক্ষে সুবিধা হয়। পূর্বদিন যদি কোন শৈথিল্য হইয়া থাকে, তাহা যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

সম্পূর্ণরূপে অনলস না হইলে কেহই অধ্যয়নে, জ্ঞানার্জনে বা পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে না। ছাত্রাবস্থায় অনলস কর্মে অভ্যস্ত না হইলে পরবর্তী জীবনেও আলস্য পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। ফলে সমস্ত জীবনই বিফল হইয়া যায়। সর্বদা মনে রাখিবে অনলস কর্মই জীবনের প্রধান কর্তব্য। কর্ম দিয়াই আমাদের জীবন গঠিত। কর্ম-হীন বা অলস জীবন একেবারেই অর্থহীন।

অনেক ছাত্র নিজেকে এমন বুদ্ধিমান মনে করে যে তাহার ধারণা, বেশি অধ্যয়ন না করিলেও বা বহু সময় আলস্যে অপচয় করিলেও বুদ্ধির বলেই সমস্ত শৈথিল্যের প্রতিকার করিয়া লইবে। ইহা কখনো সম্ভব নহে। আলস্য করিয়া যে সময় নষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিকার কখনো হইতে পারে না। বহু ছাত্র নিজের বুদ্ধির প্রতি অতিবিশ্বাসবশত আলস্যের বশবর্তী হইয়া অধ্যয়নের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। যে বিষয় পড়িতে এক মাস সময়ের প্রয়োজন, এই সকল ছাত্রেরা মনে করে তাহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা তাহা এক সপ্তাহেই আয়ত্ত করিবে। ইহা সম্ভব তো নয়ই এবং যদিই সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট তিন সপ্তাহে তাহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহ পরিশ্রম করিলে আরও অনেক বেশি অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ হইত না কি? সুতরাং আলস্যে কালহরণ কোন-মতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

দীর্ঘসূত্রতা আলস্যেরই সহোদর। আলস্য বলে, কাজ করিও না। দীর্ঘসূত্রতা বলে, এখন করিও না, পরে করিও। কেন? যাহা এখন

করিতে পার, তাহা পরে করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিবে কেন ? একটা কথাই আছে, আজ যাহা করিতে পার, কল্য করিব বলিয়া তাহা রাখিয়া দিও না। ইহা অতি মূল্যবান উপদেশ। বিনা কারণে, পরে করিব বলিয়া যাহারা কাজ ফেলিয়া রাখে, অনেক সময়েই সেই কাজ সেই পরবর্তী কালেও করা হয় না, আরও পরবর্তী কালের জন্য ফেলিয়া রাখা হয়। অনেক সময়ে এইরূপ করিয়া ফেলিয়া রাখিতে রাখিতে কাজটি আদৌ করা হয় না।

বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যাহাকে আমরা বেশ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া জানি, ক্রমশ যেন তাহার অধ্যয়নের শক্তি বা অধ্যয়নে অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, আলস্যই উহার প্রধান কারণ। এই আলস্য নিবারণের একমাত্র উপায় ইহাকে প্রশ্রয় না দিয়া শ্রমশীলতার অনুশীলন। ইহা ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ নিজস্ব কর্তব্য। অপরে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে মাত্র। যেমন, যাহার প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হয়, তাহাকে হয়তো জাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জাগিয়াও যদি সে তৎক্ষণাৎ কর্মতৎপর না হয়, কর্মে শৈথিল্য দেখায়, অবান্তর কাজে সময় নষ্ট করে বা পুনরায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্যের পক্ষে তাহাকে অনলস করিয়া তোলা সম্ভব নয়। নিজে দৃঢ় সংকল্পের সহিত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কর্মঠ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

নিদ্রা আলস্যের পরম বন্ধু। প্রতিদিন রাত্রে সাত বা আট ঘণ্টা নিদ্রা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বেশি নিদ্রা আলস্যেরই ফল। কর্মে অনিচ্ছা হইলেই শুধু শুধু বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। এবং ইহার সহিত নিদ্রা আসিয়া পড়ে। রাত্রিতে নিয়মিত সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে শুইবে না বা ঘুমাইবে না। দিবানিদ্রা ছাত্রজীবনের পক্ষে

মারাত্মক। আলস্যের ফলে যেমন নিদ্রা বাড়ে বা অসময়ে ঘুমাইবার ইচ্ছা হয়, তেমনি অতিরিক্ত পরিমাণ নিদ্রা হইতে আলস্য বর্ধিত হয়। এই দুইটি অভ্যাসই পরস্পরের সহায়ক। ঘুমাইলে শরীরের তেজ কমিয়া যায় বলিয়া অনেক সময়ে ঘোড়াকে রাত্রেও শুইয়া ঘুমাইতে দেওয়া হয় না। তাহাকে দাঁড় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রিতে পড়িতে বসিয়া যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়েন, সেজন্য টিকির সহিত একটি দড়ি বাঁধিয়া তাহা জানালার সহিত বাঁধিয়া রাখিতেন। ঘুমের আবেশে মাথা নীচু হইলেই দড়ির টানে জাগিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিতেন। অতিনিদ্রা বা অসময়ে নিদ্রা অত্যন্ত অপকারী। দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে উহা বর্জন করিবে।

কেহ কেহ ছুটির সময়ে দিবানিদ্রা দূষণীয় মনে করে না। কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। যাহা দোষের, তাহা সর্বদাই দোষের। ছুটির সময় আলস্যে সময় নষ্ট করিবার সময় নয়। পড়াশুনার শেষ নাই। কখনই কোন পড়া একেবারে শেষ হইতে পারে না। সুতরাং পড়াশুনা শেষ হইয়া গিয়াছে, এই অজুহাতে খানিকটা ঘুমাইয়া লওয়া ন্যায়সংগত কার্য নহে।

অনেক সময়ে মনের মধ্যে নানা প্রকার অজুহাত প্রস্তুত করিয়া ছাত্রেরা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। আজ শরীরটা ভাল লাগিতেছে না, আজ আর পড়িব না, খানিকটা বেড়াইয়া আসি বা ঘুমাইয়া লই, এইরূপ চিন্তা মনে আসিলে বুঝিতে হইবে, আলস্য আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ আক্রমণ হইতে মনকে সর্বদা রক্ষা করিবে।

আলস্যপরায়ণ ছাত্রেরা কোন দিন কোন বিষয়েই কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে না, এই সত্যটি সর্বদা মনে রাখিবে।

সময়ানুবর্তিতা

সকলের পক্ষেই সময়ানুবর্তিতা একটি মহৎ গুণ। ছাত্রগণ অতি যত্নের সহিত এই গুণ অর্জন করিবে। সমস্ত দৈনন্দিন কার্য ঠিক সময়মত করিবার অভ্যাস একটি অতি সৎ অভ্যাস। ইহাতে মনের নিরলসতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা সম্যক্ বর্ধিত হয়। প্রাতে ঠিক সময় নিদ্রাত্যাগ করিবে। ঠিক সময়ে স্নান করিতে যাইবে, ঠিক সময়ে আহার করিবে। ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবে। কখনো বিলম্ব করিবে না। বিকালে খেলার সুযোগ বা অভ্যাস থাকিলে, তাহাও ঠিক সময়মত করিবে এবং সময়মত খেলা ছাড়িয়া বাড়ীতে বা হোস্টেলে ফিরিবে। সময়মত পড়িতে বসিবে।

তোমরা হয়তো বলিবে, এরূপ সমায়ানুবর্তিতা সম্ভব নয়। একথা ঠিক নহে। দুই চারি মিনিট এদিক ওদিক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহা দূষণীয় নয়। কিংবা কোন বিশেষ কারণে, যেমন কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে, দৈনন্দিন কর্মসূচী হয়তো বিপর্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু এই বিপর্যয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সময়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইচ্ছা যাহা ইচ্ছা করিবার অভ্যাস অত্যন্ত অন্যায়। কোন সময়ে কোথাও যাইবার কথা থাকিলে, ঠিক সেই সময়ে যাইবে। ধীরসুস্থে, আলস্য করিয়া বা শুধু সময়ের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য সময় ঠিক না রাখা কখনই কর্তব্য নয়। ছাত্রজীবনে এই কদভ্যাস বদ্ধমূল হইলে পরে আর ইহার সংশোধন করা যায় না।

সময়ানুবর্তিতার অভাব মনের এক প্রকার অসংযমেরই পরিচায়ক। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রতিকূল। তোমরা হয়তো

মনে করিবে নিয়মিতরূপে সময়ানুবর্তিতা পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা নহে। আমি বাইশ বৎসরের ছাত্রজীবনে এবং ত্রিশ বৎসরের অধ্যাপক-জীবনে একদিনের জন্যও ক্লাসে দুই চার মিনিটের জন্যও 'লেট' হই নাই। একথার মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও সময়ানুবর্তিতার ব্যতিক্রম খুব বেশি হয় না। ইহা পূর্বার্জিত অভ্যাসেরই ফল। শরীর মন আরও দুর্বল হইয়া পড়িলে হয়তো ইহার ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ছাত্রজীবনে এই গুণ অর্জনের পক্ষে কোন বাধা নাই।

সময়ানুবর্তিতা যথাযথ পালনে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। যেখানে আটটার সময়ে যাইবার কথা, সেখানে সাড়ে সাতটায় গিয়া বসিয়া থাকিলে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। আবার আটটার পর বেশি দেরি করিয়া গেলে হয়তো আরও আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইতে পারে বা যে কাজের জন্য যাওয়া তাহা একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যাইতে পারে। হয়তো ইহার জন্য পুনরায় একদিন দুই তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে হইতে পারে।

ক্লাসে যাইবার সময়ে বিলম্বে গেলে উপস্থিতি সম্বন্ধে গোলমাল হইবে, যেখানে তুমি সাধারণত বসিয়া থাক, সেখানে বসা হইবে না, শিক্ষকের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়া গেলে তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। এইরূপে নিজের এবং অন্যের সকলেরই অপ্রীতির কারণ হইবে।

যে সময়ে তোমার বাড়ী ফিরিবার কথা, সে সময়ে বাড়ী না ফিরিলে বাড়ীর সকলে উদ্বিগ্ন হইবেন। যে সময়ে তোমার বাড়ী হইতে বাহির হইবার কথা সে সময়ে বাহির না হইলে পথে অযথা তাড়াহুড়া করিতে হইবে। ইহাতে যে শুধু অসুবিধা হয় তাহা নয়, বহুবিধ বিপদের আশঙ্কাও আছে।

কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নির্দিষ্ট থাকিলে, ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে তিনি বিরক্ত হইবেন। বিবিধ মিথ্যা অজুহাত দিয়া তোমার কদভ্যাসের ফল সমর্থন করিতে হইবে। ইহাতে মনের যে বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইবে, তাহা মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে।

যে পড়া বা অন্য যে কাজ তোমাকে দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিবার কথা, তাহা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করিবে। তাহা হইলে অযথা বিলম্বের জন্য তোমাকে নিজের কাছে বা অপরের কাছে কোন প্রকার দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতে হইবে না। এই কার্য সময়মত সম্পন্ন না করিলে হয়তো ইহার পরবর্তী কর্তব্যগুলিও সময়মত করিতে পারিবে না। ফলে সমগ্র দিনের কাজের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া যাইবে।

অনেক সময়েই দেখিবে, একটি বিষয়ে সময়ানুবর্তিতার অভাব ঘটিলে তাহার কুফল পরবর্তী সকল কর্মের মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে। যেমন, প্রাতঃকালে সময়মত স্নান না করিলে, আহারে বিলম্ব হইবে, আহারে বিলম্ব হইলে, বিদ্যালয়ে যাইতে বিলম্ব হইবে, বিদ্যালয়ে যাইতে বিলম্ব হইলে ক্লাসে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইবে। এই বিলম্বের ফলে হয়তো উপস্থিত হইয়াও অনুপস্থিত হইয়া যাইবে। কর্মপরম্পরা লইয়াই আমাদের জীবন গঠিত। ইহার মধ্যে এক স্থানে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তাহা বিবিধরূপে অন্যান্য কার্যেও বিশৃঙ্খলা আনিবে। সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে সচেতন থাকিলে বহু বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস আয়ত্ত হইবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

স্বাস্থ্য-রক্ষা মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। কথায় আছে, শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। সকল প্রকার কর্তব্যের মধ্যে প্রথম কর্তব্য স্বাস্থ্য-রক্ষা। শরীর সুস্থ না থাকিলে তাহার পক্ষে কোন কাজই সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শরীরের প্রতি কখনো অবহেলা করিবে না।

প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। গাত্রোত্থানের পর শৌচাদি ক্রিয়া সারিয়া অল্প ব্যায়াম করা ভাল। বৈকালেও কাজের শেষে কোন প্রকার খেলা বা ব্যায়াম দ্বারা কিছুক্ষণ শরীরের পরিচালনা করিবে।

নিয়মিত সময়ে আহার করিবে। প্রত্যহ একই সময়ে আহার করিবে। যখন বিদ্যালয় খোলা থাকে তখন নয়টায় খাইবে এবং রবিবার আসিলেই বারটা বা একটায় খাইবে, এরূপ কখনই করিবে না। ইহাতে পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অল্প বয়সে এই সকল বিশৃঙ্খলার কুফল সব সময়ে বুঝা যায় না। কিন্তু এইরূপ অনিয়মিত সময়ে আহার অভ্যাসে পরিণত হইলে ইহা হইতে গুরুতর পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে। অনেক সময়ে এই পীড়া দুরারোগ্য এবং দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। যাহার যে সময়ে আহার করিবার অভ্যাস, প্রত্যহ ঠিক সেই একই সময়ে আহার করিবে। দশ পাঁচ মিনিট বা আধ ঘণ্টা পর্যন্ত এদিক ওদিক হইতে পারে কিন্তু তাহার বেশি ব্যতিক্রম যাহাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

ছোট বড় কোন অসুখই অবহেলা করিবে না। সামান্য অসুখ হইলেই তাহার যথাযথ প্রতিকার করিবে। তাহা না করিলে রোগ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে পারে। যে অসুখ প্রথমাবস্থায় সামান্য চিকিৎসায় বা সামান্য সাবধানতায় সারিয়া যাইতে পারিত, অবহেলার ফলে তাহা

গুরুতর হইয়া পড়িতে পারে। শরীরযন্ত্রটি যেমন জটিল, যেমন কষ্টসহ, তেমনি ভঙ্গুর, ইহা সর্বদা মনে রাখিবে। কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি হইবামাত্র তাহা সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সামান্য একটু সর্দিকাশি, সামান্য একটু পেটের গোলমাল বা সামান্য একটু দাঁত কনকনানি, প্রভৃতি সামান্য ব্যাপারগুলিকে কখনই সামান্য মনে করিয়া অবহেলা করিবে না। প্রত্যেক সামান্য ব্যাপারেই যে বড় ডাক্তার ডাকিবে তাহা নয়। ডাক্তার ডাকিয়াই হউক, বা না ডাকিয়াই হউক, বা আত্মীয়স্বজনের পরামর্শমতই হউক, যে ভাবেই হউক, ঐ সামান্য উপসর্গগুলিকে সম্পূর্ণ নির্মূল না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না।

যে সকল ছাত্রেরা প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া খেলাধূলা বা ব্যায়াম করে, তাহাদের স্বাস্থ্য সাধারণত ভাল থাকে। খেলা বা ব্যায়াম এমন হইবে, যাহাতে সমস্ত শরীর বেশ ঘামিয়া যায়। সুস্থ যুবকের পক্ষে এক ঘণ্টা খেলাধূলা করা খুবই সমীচীন। যাহাদের শরীর স্বভাবতই দুর্বল, তাহাদের পক্ষেও কিছুক্ষণ করিয়া খেলাধূলা করা কর্তব্য।

আহার সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণ সাবধানতা আবশ্যক। আমাদের খাদ্যের মধ্যে কয়েকটি প্রধান উপাদান আছে। যেমন, কার্বোহাইড্রেট্। ভাত, রুটি প্রভৃতিতে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। মাছ, মাংস ডিম প্রভৃতিতে বহুপরিমাণে প্রোটিন থাকে। ঘি, মাখন, প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া জল, বিবিধ প্রকার লবণ এবং ভিটামিন বিবিধ খাদ্যের মধ্যে থাকে। আমরা যে তরকারী খাই, তাহার অধিকাংশের মধ্যে উক্ত প্রকার কোন সারপদার্থ থাকে না। তবে তাহাতে জল, ভাইটামিন প্রভৃতি থাকে এবং থাকে সেলুলোজ। এই তরকারির উপকারিতা দুইটি—প্রথমত ইহার সংযোগে

খাদ্যবস্তুর স্বাদ ভাল হয় এবং উহার পরিমাণ বাড়ে। দ্বিতীয়ত ইহাতে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া কোষ্ঠপরিষ্কারে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরা সাধারণত যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহাদের সকলেরই কিছু না কিছু গুণ আছে। দেহের রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য সকল প্রকার খাদ্যেরই প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার খাদ্যই যেন অতিরিক্ত বেশি বা অতিরিক্ত কম না হয়। শুধু মাছ-মাংস বেশি পরিমাণ খাইলে শরীর সুস্থ থাকিবে না। তেমনি শুধু শাকসব্জী বেশি করিয়া খাইলেও শরীর ভাল থাকিবে না বা সম্যক্ পুষ্টি হইবে না।

সকল ছাত্রের পক্ষে ঠিক শরীরের প্রয়োজনমত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। নিজ নিজ রুচি, আর্থিক সামর্থ্য, বাড়ীর বা হোস্টেলের সাধারণ খাদ্যব্যবস্থা প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। শরীর কোনরূপ অসুস্থ হইলে বা খাদ্যসম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন মনে জাগিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

আহারের পরিমাণ সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে। সুস্থ যুবকের পক্ষে অনেক সময়েই অত্যধিক পরিমাণে আহার করিবার ইচ্ছা হয়। এইরূপ ইচ্ছা সংযত করিতে হইবে। অল্প বয়সে ইহার কুফল বুঝা না গেলেও বয়স বাড়িলে বিবিধ প্রকার পাকস্থলীর বা অন্ত্রের পীড়া হইতে পারে। কোন কোন হোস্টেলে সময়ে সময়ে আহার-প্রতিযোগিতা হয়। কে কত ভাত খাইতে পারে বা কে কত সন্দেশ খাইতে পারে, ইহা লইয়া প্রতিযোগিতা হয়। এরূপ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

অবিরত কোন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকিবে না। যদি ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলো-বাতাস আসিবার ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সকালে, দুপুরে, বৈকালে, যখন সুযোগ হইবে, তখনই ঘরের বাহিরে গিয়া কিছু-

ক্ষণ করিয়া বেড়াইয়া আসিবে। অথবা কোন খোলা বারান্দায় বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া পড়াশুনা করিবে।

স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে অত্যন্ত গুরুতর পরিণামের আশঙ্কা থাকে। আমাদের সময়ে হিন্দু হোস্টেলে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজের স্বাস্থ্যসম্পর্কে শুধু উদাসীন ছিলেন তাহা নহে, অত্যন্ত অসতর্ক ছিলেন। তিনি কখনও স্নান করিতেন না বা ভাল করিয়া মুখ ধুইতেন না। কখনও কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতেন না। একটু পাদচারণা বা ভ্রমণও করিতেন না। তাঁহার শরীরে এবং মুখে সর্বদাই দুর্গন্ধ লাগিয়া থাকিত। পরিপাকশক্তি এমন হ্রাস পাইয়াছিল যে সকালে যাহা আহার করিতেন, প্রায়ই বৈকালে তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বমন হইয়া যাইত। দিবারাত্র অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। কোনরূপ চিকিৎসা পর্যন্ত করিতেন না। বি.এসসি. পরীক্ষার সময় এমন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার পরীক্ষাই দেওয়া হইল না। পর-বৎসরও পুনরায় পরীক্ষার সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হিন্দু হোস্টেল হইতে পাল্কী করিয়া গিয়া ইউনিভার্সিটিতে কোন মতে পরীক্ষা দিলেন। অনার্সের ছয় পেপারের মধ্যে চার পেপার দিয়া আর দিতে পারিলেন না। কিন্তু এই চার পেপারের নম্বরেই তিনি ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাইয়াছিলেন। এম.এ-তেও খুব ভাল ফল হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অদ্ভুত অভ্যাস কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, তাহারই ফলে তিনি অতি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ছাত্রজীবনের একটি বড় অভিশাপ বীর্যপাত। শরীরের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা প্রভৃতি সর্ব প্রকার উপাদান অপেক্ষা বীর্য শতগুণে অধিকতর সারবান পদার্থ। এই জন্যই ইহার নাম বীর্য। ইহার অপচয়ে শরীর

ও মনে বিবিধ প্রকার ক্ষতি হয়। শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য, আলস্য ও জড়তা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, কর্মে উৎসাহের অভাব, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে জীবন বিড়ম্বিত হইতে থাকে। দীর্ঘদিনের অপচয়ের ফলে আরও গুরুতর পীড়ার আক্রমণ হইতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হইবে। কৃপণের ধনের মত বীর্যরক্ষা করিবে। কথায় আছে—মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ। বীর্যপাত অত্যধিক হইলে জীবনীশক্তি হ্রাস হয় এবং বীর্যরক্ষা করিলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বীর্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন এবং সচেষ্ট থাকিবে, কিন্তু ইহার জন্য অত্যধিক চিন্তা বা উদ্বেগ করিবে না। যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য চিন্তাকুল হইয়া কোন লাভ নাই। এ সম্পর্কে অত্যধিক চিন্তা বা উদ্বেগে কুফল ফলিয়া থাকে। যাহা গিয়াছে তাহার জন্য উদ্বেগ না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবে। এই বিষয়ের চিন্তা যত কম করিবে ততই মঙ্গল। মনকে সর্বদাই পড়াশুনা এবং অন্যান্য সৎচিন্তা ও সৎকর্মে নিয়োজিত রাখিবে। তাহা হইলে কুচিন্তা মনে স্থান পাইবে না।

শরীর ও মনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য জীবনের পরম সম্পদ। স্বাস্থ্য ব্যতীত কোন কর্মই সুসম্পন্ন করা যায় না। ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির জীবনই একটি বিড়ম্বনা। ছাত্রজীবন যেমন জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট সময়, তেমনি স্বাস্থ্য-গঠনের পক্ষেও উপযুক্ত সময়, একথা কখনই ভুলিবে না।

অনেক ছোটখাট অভ্যাসের ফলে অনেক সময় গুরুতর পরিণামের উদ্ভব হয়। বাল্যকাল হইতে দাঁত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস যাহাদের থাকে না, তাহারা পরে গুরুতর দাঁতের অসুখে এবং পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রত্যহ দাঁতন দিয়া বা টুথপেষ্ট ও টুথব্রাশ দিয়া দাঁত পরিষ্কার করায় কখনও যেন অবহেলা না হয়। পড়িতে বসিবার

সময়ে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিবে। দীর্ঘদিন মেরুদণ্ড বক্র করিয়া বসিবার অভ্যাস হইলে উহা হইতে অল্পাধিক পরিমাণে কুব্জ হইয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

বেশভূষা ও পরিচ্ছন্নতা

সর্বদা দেহ ও মন পরিচ্ছন্ন রাখিবে। প্রত্যহ স্নান করিবে। পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত রাখিবে। স্নানের সময়ে উত্তমরূপে গাত্রমার্জনা করিবে। প্রাতে ও বৈকালে মুখ প্রক্ষালন করিবে।

বাড়ী হইতে বাহির হইলেই হাতে পায়ে নাকে মুখে গলায় মাথায় ধূলি, ধূম ও অন্যান্য প্রকার অপরিষ্কৃত দ্রব্য সংশ্লিষ্ট হইবে। এইগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সুতরাং বাহির হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া প্রথমেই নাক, মুখ, গলা, প্রভৃতি ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে বেশি সময় নষ্ট হয় না। শুধু একটু অভ্যাস থাকিলেই ইহা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

গামছা ও গেঞ্জি অনেক সময়েই অপরিষ্কৃত থাকে। ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য সর্বদাই যে ধোপার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নয়। প্রত্যহ বা একদিন অন্তর স্নান করিবার সময়ে একটু সাবান দিয়া নিজেই এগুলি পরিষ্কার করিবে। এজন্য অপর কাহারও উপর নির্ভর করিবে না। প্রয়োজন হইলে সার্টও নিজে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। মলিন ও ধূলিময় জামা কাপড় শুধু দারিদ্র্যের লক্ষণ নয়, অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসেরও লক্ষণ।

বস্ত্রাদি মূল্যবান না হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা পরিষ্কৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বেশভূষার মধ্যে কোন প্রকার আতিশয্য বা অভিনবত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণত সকল ছাত্রেরা যেরূপ বেশভূষা করে তাহাই করিবে। বেশভূষায় বিলাসিতা অন্য সকল প্রকার বিলাসিতার মতই নিন্দনীয়। বেশভূষা সম্পর্কে অতি যত্ন ভাল নহে। এ সম্বন্ধে উদাসীনতায় বরং মনের তৃপ্তি আছে। তবে অপরিচ্ছন্নতা কখনই প্রশংসনীয় নয়। পরিচ্ছন্নতারও সীমা আছে। এ বিষয়েও অতিরিক্ত মনোযোগ বিলাসিতারই নামান্তর। এক ব্যক্তি স্নানের সময়ে শুধু পদদ্বয় ভাল করিয়া মার্জনা করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতেন। একজন কলেজের ছাত্র প্রত্যহ দুইবার দাড়ি কামাইতেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে আয়নার সম্মুখে দাড়ি কামাইতেন, সেটি সাধারণ আয়না নয়, একখানি বড় ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস। তাহাতে প্রত্যেকটি দাড়ি পৃথক-ভাবে সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইত এবং তিনি প্রত্যেকটি দাড়ি সমানভাবে কাটিতেন। এই কার্যে তাঁহার প্রত্যহ দুইবেলা বহু সময় ব্যয় হইত। এই ধরনের পরিচ্ছন্নতা বিলাসিতার মতই নিন্দনীয়।

পরিধেয় জামা, কাপড়, প্যাণ্ট, সার্ট, জুতা প্রভৃতি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি সর্বদাই যে মহার্ঘ হইবে, এমন কথা নাই। অপরিচ্ছন্নতা সাধারণত আলস্যেরই একটি লক্ষণ। পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত রাখিতে যেটুকু পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে বিমুখ হইলেই অপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস আসিয়া পড়ে। বহু ছাত্রের এই অভ্যাস আছে। এই কদভ্যাস হইতে অনেক সময়ে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তিও হইতে পারে।

পরিশ্রম ও অধ্যবসায়

পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি মানুষের মহৎ গুণ। আলস্য ইহার পরম শত্রু। জগতে যে যত পরিশ্রম করিবে, সেই তত পরিমাণে কৃতকার্যতা লাভ করিবে। পরিশ্রম ব্যতীত কোন কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। ছাত্রদের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া ব্যায়ামাদি ব্যতীত অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম, অর্থাৎ অধ্যয়ন করিতে যে শ্রম আবশ্যক তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না।

পরিশ্রম ও পরিশ্রমশক্তির সীমা নাই বলিলেই চলে। দৈহিক পরিশ্রম অবশ্য বাড়াইতে বাড়াইতে একটি সীমায় আসিয়া পৌঁছে। তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। কিন্তু অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রমের সীমারেখা বহুদূরে। অধ্যয়নাদি করিতে যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহার অবশ্যই সীমা আছে। কারণ আমাদের দিন, মাস, প্রভৃতির সময় যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি জীবনকালের মাত্রারও সীমা আছে। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে পরিশ্রমের পরিমাণের কোন সীমা-রেখা নাই। একই দিনে, বা এক মাসে একজন ছাত্র আর একজন অপেক্ষা অনেক অধিক অধ্যয়ন করিতে পারে। ছাত্রজীবনে সুস্থশরীরে সাধারণত ছাত্রেরা যে পরিমাণ অধ্যয়নাদি করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি অধ্যয়ন তাহারা ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে। ইহার বেশি পড়িবার প্রয়োজন নাই, পরীক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, সবই তো পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনোভাব নিন্দনীয়। যাহা পাঁচবার পড়া হইয়াছে, তাহা দশবার পড়িতে হইবে। যে সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের একটি অধ্যায় পড়া হইয়াছে, সেই বিষয়ে আরও দুই তিনখানি

পুস্তক পড়িতে হইবে। যে গণিতের যে পুস্তকের এক অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্ক কষা হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়ের অন্য পুস্তক হইতে অঙ্ক কষিতে হইবে। যে বিষয়ে খুব ভাল ধারণা হয় নাই, সে বিষয়ের অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া বিষয়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যে বিষয় কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন মনে হয়, তাহা শতবার পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। বহু কঠিন বিষয় ভাল করিয়া মনে রাখিবার জন্য পুনঃপুনঃ লিখিতে হইবে। এই সকল বিষয় একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে, দিবারাত্র কি ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম সংক্ষেপ করিলে অধ্যয়ন সংক্ষিপ্ত হইবে, জ্ঞানলাভও সংক্ষিপ্ত হইবে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা হোষ্টেলে থাক, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, তাহাদের মধ্যে বহু পরিশ্রমী ছাত্র আছে। তাহারা তাহাদের পরিশ্রমের ফলও পাইয়া থাকে। তোমরা ভাল ছেলে, তোমাদের কথা আলাদা—এইরূপ মন্তব্য অনেক সময়ে শোনা যায়। কিন্তু ভাল ছেলেরা অন্য কোন প্রকারের ছেলে নয়। তাহারা বেশি পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহারা ভাল হইয়াছে। বুদ্ধিশক্তির তারতম্য যে একেবারে নাই, তাহা নহে। কিন্তু পরিশ্রমশক্তির তারতম্যই সাফল্যের তারতম্যের মুখ্য কারণ। আমরা যাহাকে প্রতিভা বলি, তাহার প্রায় সবটুকুই শ্রমশক্তির প্রকাশ। কখনও কোন স্থলে কেহ বুদ্ধিবলে সহসা একটি মহৎ কার্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু এই সকল অতিবিরল দৃষ্টান্তের অনুকরণ অসম্ভব। এই সকল বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যেও অনেক স্থলেই দেখা যাইবে, এই আপাতসহজ সাফল্যের পশ্চাতে বহু শ্রম, বহু সাধনা সঞ্চিত ও লুক্কায়িত আছে।

যে কোন কার্য, অধ্যয়নই হউক বা অন্য কোন কার্যই হউক,

পরিশ্রম ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। যাহা পড়িবে, যাহা লিখিবে, সকলই যথাসম্ভব নিখুঁত করিবার চেষ্টা করিবে। একটি প্রবন্ধ দশ মিনিটেও লেখা যায়, আবার দুই ঘণ্টা বসিয়াও লেখা যায়। শুধু দৈর্ঘ্যের কথা নয়, প্রবন্ধের ভাব, ভাষা, প্রভৃতি, যত ভাবিয়া চিন্তিয়া, যত মনোযোগ দিয়া, যত পরিশ্রম করিয়া লিখিবে, ততই ভাল হইবে। এমন কি, হাতের লেখাও যত্ন করিয়া, পরিশ্রম করিয়া লিখিলে বেশি সুন্দর হইবে। কখনো কোন কাজ তাড়াতাড়ি, যেমন তেমন করিয়া, শেষ করিবার চেষ্টা করিবে না। কোন কাজই অবহেলার বিষয় নয়। সামান্য চার লাইন কবিতা মুখস্থ করাই হউক, বা কঠিন একটা অঙ্কের সমাধানই হউক, উভয়ই অতি যত্ন, মনোযোগ ও শ্রম সহকারে সম্পন্ন করিবে। যে কোন কাজই হউক, উহার জন্য যত পরিশ্রম করিবে, ততই উহা ভাল হইবে।

অনেক কাজ, অনেক অধ্যয়নের বিষয় হয়তো কঠিন মনে হইবে। কিন্তু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে ক্রমশ উহা সহজ হইয়া যাইবে। একবার চেষ্টায় কৃতকার্য না হইলে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিবে। নিবিষ্টমনে একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় অনুসরণ করাকে অধ্যবসায় বলা হয়। প্রথমে অকৃতকার্য হইলেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ক্রমাগত যত্ন ও শ্রম সহকারে অগ্রসর হইলে ক্রমশ কৃতকার্যতা আসিবে। কথিত আছে, জনৈক সেনানায়ক (রবার্ট ব্রুস) উপর্যুপরি অকৃতকার্যতার পর ভগ্নহৃদয়ে শুইয়া ছিলেন। ঘরের কোণে একটি মাকড়সার ক্রমাগত বিফল প্রচেষ্টা এবং তৎসত্ত্বেও তাহার অধ্যবসায়ের ফলে অবশেষে কৃতকার্যতা লক্ষ্য করিয়া ইনি আশান্বিত হন এবং পূর্ণোদ্যমে স্বকার্যে অবতীর্ণ হইয়া সফলকাম হন।

শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের বহু দুর্বলতা, বহু অসম্পূর্ণতা

অতিক্রম করা যায়। একখানি শিলাখণ্ডের উপর অতি কোমল ক্ষুদ্র জলবিন্দু যদি দীর্ঘকাল যাবৎ পড়িতে থাকে, তবে কঠিন শিলাখণ্ডও অতি কোমল জলবিন্দু দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তেমনি ছাত্রদিগের নিকট কোন বিষয় অত্যন্ত কঠিন মনে হইলেও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে তাহার কঠিনতা দূর হইয়া সহজ ও সরল হইয়া যাইবে। ছাত্রজীবনে বা পরবর্তী জীবনে যাঁহারা কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের কর্ম ও অভ্যাস সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, তাঁহারা শ্রম ও অধ্যবসায়ের বলেই সফলতা লাভ করিয়াছেন।

সাংসারিক সফলতার মূলে শ্রম ও অধ্যবসায় ব্যতীত অন্য বিবিধ প্রকার কারণ অনেক সময়ে বর্তমান থাকে। সুযোগ এবং অন্য ব্যক্তিগণের সহায়তা, সহানুভূতি, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কার্যকারণ উহার সহিত জড়িত থাকে। কিন্তু শ্রম ও অধ্যবসায়ই সর্বপ্রকার সফলতার মূলে, একথা অতি সত্য। অন্য সাংসারিক কার্যে যাহাই হউক না কেন, অধ্যয়নের বিষয়ে এবং জ্ঞানলাভের বিষয়ে শ্রম ও অধ্যবসায়ই একমাত্র পাথেয়।

অধীতব্য বিষয় সম্পর্কে মনে দ্বিধা থাকিলে, সে বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায় না, বা সে বিষয়ের জন্য যথেষ্ট শ্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেইজন্য, বিষয় নির্বাচনের সময়ে বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া মন স্থির করিয়া লইবে। তারপর বিষয় নির্বাচিত হইয়া গেলে মনে আর কোনরূপ দ্বিধা রাখিবে না। কায়মনোবাক্যে অধীতব্য বিষয় যথাসাধ্য আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সর্বপ্রকার বাধা ও সর্বপ্রকার কঠিনতা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় শ্রমশীলতা এবং অধ্যবসায়।

সকলপ্রকার অভ্যাসই অনুশীলনদ্বারা আয়ত্ত হইয়া থাকে। শ্রমশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাসও ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রম

করিতে করিতেই বেশি শ্রম করিবার অভ্যাস জন্মে। তেমনি আলস্যের প্রশ্রয় দিলেই আলস্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহুদিন পূর্বের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বলিয়াছিলেন, I shall spill my blood drop by drop in order to be a first class first. পরিশ্রম করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইলে এমনি মানসিক অবস্থা হয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে, এইরূপ সংকল্প প্রশংসনীয় হইলেও, কার্যত এইরূপ রক্তপাত বা স্বাস্থ্যহানি করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে।

জ্ঞান-আহরণ

ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান-সঞ্চয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইতে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাই যথেষ্ট এবং সম্পূর্ণ, ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্টিলাভ করা সঙ্গত নহে। অবশ্য পাঠ্যপুস্তক অবহেলা করিয়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়া অতীব অন্যায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক ব্যতীতও অন্য বহু প্রকারে জ্ঞান-সঞ্চয়ের অবকাশ আছে।

পাঠ্যপুস্তকপাঠও জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য, একথা মনে রাখিতে হইবে। ছাত্রদিগকে বিবিধ পরীক্ষা পাস করিতে হইবে, এজন্য পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি আবশ্যক হইবে। কিন্তু কোন প্রকারে পরীক্ষা-পাসই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিলে ভুল হইবে। এইজন্য পাঠ্য-পুস্তকগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুস্তক পড়িবার সময়ে, ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে রাখিবে। জ্ঞানলাভের স্পৃহা

এবং তাহার জন্য সংকল্প মনে থাকিলে, সমস্ত পাঠ্যপুস্তক এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত পুস্তকই জ্ঞানের উৎস বলিয়া মনে হইবে এবং অধ্যয়নও আনন্দদায়ক হইয়া উঠিবে। অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানার্জনস্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। শৈশব হইতেই মানুষ সর্বদা বিবিধ উপায়ে জ্ঞানার্জন করিতে করিতেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা এই জ্ঞানার্জনস্পৃহা কখনই ব্যাহত হওয়া উচিত নয়।

কলেজ বা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্র হইতেও জ্ঞান আহরণ করিবে। হোষ্টেলের বা কলেজের উপরিতন ক্লাসের মেধাবী ছাত্রদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলে বা কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সহায়তা লইলে, অনেক বিষয় শিখিতে পারিবে। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কোথাও কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিলে, তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিবে। এস্থলে একটু সাবধানতা আবশ্যক। বর্তমানে এত স্থানে এত বিষয়ে এত বেশি বক্তৃতাদি হয়, যে তাহা হইতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিয়া তবে বক্তৃতা শুনিতে যাইবে। যেখানে সেখানে সর্বপ্রকার বক্তৃতা শুনিতে গেলে শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষাই বেশি হইবে এবং মূল্যবান সময়ের অপচয় হইবে। বর্তমান যুগে, বিশেষত বড় নগরীতে এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক।

গ্রন্থাগারসমূহে বহু প্রকার বহু পুস্তক থাকে। তাহার মধ্যে অনেক পুস্তক পাঠ্যবিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহা হইতে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক হইতে সংগৃহীত জ্ঞান আরও বর্ধিত করা যাইতে পারে। এস্থলেও সুনির্বাচন আবশ্যক। নতুবা সময়ের ও পরিশ্রমের অপচয় হইবে। এ বিষয়ে উপরিতন শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র বা শিক্ষকগণের পরামর্শ লইবে।

সংবাদপত্র হইতেও বহু প্রকার জ্ঞানলাভ করা যায়। তবে আধুনিক

যুগে এত বেশি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং সেগুলিতে এত বেশি বিবিধ প্রকারের রচনা প্রকাশিত হয় যে সেগুলি সমস্ত পাঠ করা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যে যে-বিষয়ের ছাত্র, সেই বিষয়ে কোন ভাল প্রবন্ধ পাইলে, তাহা পড়িবে। যেমন, যে বিজ্ঞানের ছাত্র, কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলে তাহা মনোযোগ দিয়া পড়িবে। যে স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র, স্থাপত্যবিষয়ক প্রবন্ধ তাহার পড়া উচিত। এইরূপ বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য যে সকল বিষয় সংবাদপত্রে থাকে, তাহা হইতে দেশ-বিদেশের বড় বড় সংবাদগুলি মোটামুটি পড়িবে। ইহাতে দেশ সম্বন্ধে এবং জগৎ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান বাড়িবে। সংবাদপত্র না পড়িলে এই সকল নিত্য নূতন সংবাদ পাইবে না এবং ক্রমশ কূপমণ্ডূক হইয়া পড়িবে। সংবাদপত্র পাঠ যেমন আবশ্যক, তেমনি এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতাও আবশ্যক। সংবাদপত্রে ছাত্রজীবনের পক্ষে অবান্তর এত বেশি রচনা প্রকাশিত হয়, যে সেগুলি পাঠ করিয়া শুধু যে সময়ের অপচয় হয়, তাহা নহে, এই সকল অবান্তর কথার রাশি মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তাশক্তিকে আবিল ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সংবাদপত্র লইয়া পড়িয়া থাকা অতীব গর্হিত অভ্যাস। উপর্যুক্ত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যান্য সংবাদাদি পড়িতে পনের কুড়ি মিনিটের বেশি সময় অতিবাহিত করা কর্তব্য নয়। সংবাদপত্রে বহু বিষয় থাকে, যাহা ছাত্রগণের পক্ষে একেবারেই অপাঠ্য।

দেশ-ভ্রমণ জ্ঞানলাভের একটি উপায়। ছুটির সময়ে সুযোগ পাইলে, কিছুদিনের জন্য নূতন স্থানে ভ্রমণ করায় আনন্দ ও জ্ঞানলাভ উভয়ই হইয়া থাকে। নূতন স্থানের বিবিধ প্রকার ভাষা, বিবিধ প্রকার নরনারী, বিবিধ প্রকার বেশভূষা, বিবিধ প্রকার রীতিনীতি, বিবিধ প্রকার খাদ্য,

বিবিধ প্রকার গৃহ, অট্টালিকা, মন্দির, যানবাহন প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয় এবং বিবিধ প্রকার সাংসারিক ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। বিভিন্ন দেশের তরুলতা, শস্যক্ষেত্র, বন, প্রান্তর, পর্বত প্রভৃতি প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য মনে প্রভূত আনন্দ আনিয়া দেয় এবং নূতন প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। হিমালয়ের প্রশান্ত উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং সাগরের অনন্ত নীলিমাময় ঊর্মিমালা কাহার মনকে উল্লসিত না করে? প্রকৃতির সহিত যাহার যত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মনে তত বেশি প্রশান্তির সঞ্চয় হইয়াছে।

জ্ঞানী ব্যক্তির সাহচর্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সুযোগ পাইলেই জ্ঞানী ব্যক্তির সন্নিকটে যাইবে এবং তাঁহার সহিত বিনীতভাবে আলোচনা করিবে, প্রশ্ন করিবে, ধীরভাবে তাঁহার বক্তব্য শুনিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত সদালাপের সুযোগ সর্বদা পাওয়া যায় না। যদি কখনও পাও, কখনও সে সুযোগ হারাইবে না।

জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে বহু জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে এবং অনুকরণযোগ্য বহু গুণের সন্ধান পাইবে। অনেকস্থলে দেখিবে, যে সকল গুণের কথা শুধু নীতিপুস্তকে পড়িয়াছ এবং হয়তো দুরধিগম্য মনে হইয়াছে, সেই সকল গুণ এই সকল মহৎ ব্যক্তির আচরণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। অনেক সময়ে মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত হইতে নিজের বহু সংশয় দূরীভূত হইবে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মন স্বীয় কর্তব্য স্থির করিতে পারিবে। বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা নীরস নীতিকথা অপেক্ষা বহুগুণে শিক্ষাপ্রদ।

পাঠ্যপুস্তকের সীমার বাহিরে অন্যান্য বহু প্রকার পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান অর্জন করা যাইতে পারে। তবে ছাত্রজীবনে অবান্তর পুস্তক পাঠ অতি সাবধানে করিবে। এই সকল অবান্তর পুস্তকের মধ্যে সাময়িক

পত্রিকা এবং গল্প-উপন্যাস, এই দুইটিই প্রধান। অর্থাৎ ছাত্রজীবনে এই দুইটি শ্রেণীর পুস্তক পড়িবার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে তীব্র হইয়া উঠে। বর্তমান যুগে লেখক-সংখ্যা অসংখ্য। তাহাদের রুচি ও ভাষাও বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং বিশেষ নির্বাচন না করিয়া সর্বপ্রকার সাময়িক পত্র বা সর্বপ্রকার গল্প-উপন্যাসাদি পাঠ করা সঙ্গত নয়। অনেক সাময়িক পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদ, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। সেগুলি পাঠ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিবিধ সাময়িক পত্রিকার বিবিধ প্রকার রচনা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ছাত্রগণের পক্ষে পাঠ করা অনুচিত। মার্জিত রুচি বিশিষ্ট লেখকের উৎকৃষ্ট পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকই ছাত্রগণের পাঠ করা কর্তব্য নয়। ইহাতে কোন জ্ঞানলাভ হয় না, শুধু মানসিক অবনতি ঘটে।

সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র মনুষ্যসমাজ এবং সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই অগণিত শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। নিজের মন এবং চক্ষু, কর্ণ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। প্রতিদিনের প্রায় প্রতিমুহূর্তেই ছোট বড় বহু শিক্ষণীয় বিষয় তোমার কাছে আসিয়া পড়িবে। ট্রামে বাসে কিরূপে উঠিতে বা নামিতে হয়, ইহাও যেমন শিক্ষণীয়, গভীর গণিতীয় তত্ত্বও তেমনিই শিক্ষণীয়। ছাত্রজীবনই এই সকল প্রকার শিক্ষা ও জ্ঞান-আহরণের প্রকৃষ্ট সময়।

ক্রীড়া ও ব্যায়াম

ছাত্রজীবনে ক্রীড়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শরীর মন সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখিতে হইলে প্রত্যহ কিছুক্ষণ খেলাধুলা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহারা খেলাধুলা করে, সাধারণত তাহাদের স্বাস্থ্য যাহারা খেলাধুলা করে না, তাহাদের অপেক্ষা ভাল।

কলিকাতার বাহিরে ছোট নগরে বা পল্লীতে খেলাধুলার কোন অসুবিধা নাই। কিছুটা উন্মুক্ত স্থান সর্বত্রই আছে। সেখানে ছাত্রেরা নানা প্রকার খেলা সহজেই খেলিতে পারে। গোল্লাছুট, দাড়িয়াবাঁধা, বুড়ী-চি, কপাটি, প্রভৃতি খেলা অনেকেই খেলিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ফুটবল, হকি, ক্রিকেটও আছে। পুষ্করিণীতে বা নদীতে সাঁতার কাটাও একটি অতি উত্তম ক্রীড়া।

এই সকল ক্রীড়া ছাড়াও বিবিধ প্রকার ব্যায়াম করা যাইতে পারে। শুধু হাতে দাঁড়াইয়া বসিয়া বা শুইয়া নানা প্রকার ব্যায়াম করা যায়। এ বিষয়ে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদিগের নিকট শিক্ষা ও পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। উঠা-বসা, বিবিধ প্রকার ডন ফেলা অতি উত্তম ব্যায়াম।

যাহার যেরূপ রুচি, বা পছন্দ, সেইরূপ কয়েকটি খেলা বা ব্যায়াম নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহা অভ্যাস করিবে। ব্যায়ামের বা খেলার রূপ মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হইলে কোন ক্ষতি নাই। একসঙ্গে দুই তিন প্রকারের খেলা বা ব্যায়ামেও কোন বাধা নাই। পল্লী-অঞ্চলের বালকেরা নানা প্রকার খেলা খেলিয়া থাকে, বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করে, আবার বহুক্ষণ ধরিয়া সাঁতারও কাটে।

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে এবং মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা রক্ষার পক্ষে

ক্রীড়া অতীব আবশ্যক। এ বিষয়ে পল্লী-অঞ্চলের ছাত্রেরাই বেশি ভাগ্যবান। কারণ তাহাদের পক্ষে খেলার সঙ্গী পাওয়া বা উন্মুক্ত স্থান পাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু নগরের অধিবাসীগণের পক্ষে খেলা-ধুলার ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। বিবিধ প্রকার খেলার জন্য বিবিধ প্রকার প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক বালকের বা যুবকের স্থান হইতে পারে। এই সকল ক্লাবের সভ্য হইলে চাঁদা প্রভৃতি উপলক্ষে খরচও আছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে তাহা বহন করা দুঃসাধ্য। স্কুল কলেজের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া পুনরায় খেলার জন্য দূরস্থিত কোন ক্লাবে যাতায়াত করাও যেমন অসুবিধা, সময়ের অপচয়ও অত্যন্ত বেশি। সুতরাং সামান্য কয়েকটি ছাত্র ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে খেলাধুলার ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। অনেক স্কুল ও কলেজের মধ্যে ক্রীড়াদির জন্য প্রাঙ্গণ আছে, ব্যায়ামের জন্য ব্যায়ামাগারও আছে। স্কুল বা কলেজের টিফিনের সময়ে কিছুক্ষণ সেখানে খেলা চলিতে পারে বা যাহারা হোষ্টেলে থাকে তাহারা ব্যায়ামাগারে ব্যায়ামও করিতে পারে।

খেলাধুলা বা ব্যায়ামের যেখানে যে সুযোগ আছে, ছাত্রেরা কখনও সে সুযোগের অবহেলা করিবে না। ছাত্রজীবনে যে শুধু জ্ঞানলাভেরই মূলপত্তন হয়, তাহা নহে, এই সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার স্বাস্থ্য-জীবনেরও পত্তন হইয়া থাকে। যাহারা ছাত্রজীবনে নিয়মিত খেলাধুলা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে, তাহারা পরবর্তী জীবনেও স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে।

নগরের অধিকাংশ ছাত্রেরই খেলাধুলা করিবার ভাল সুযোগ নাই। তাহাদের পক্ষে কর্তব্য সকালে ও বৈকালে কিছুক্ষণ করিয়া ব্যায়াম

করা। ঘরের মধ্যে বা বারান্দায় উঠা-বসা, ডন ফেলা বা মুগুর ভাঁজা অতি উত্তম ব্যায়াম। মনোযোগ সহকারে এবং দৃঢ়তাসহকারে এই সকল ব্যায়াম করিলে কুড়ি মিনিট হইতে আধঘণ্টাই যথেষ্ট।

খেলাধুলা ও ব্যায়ামের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যের উন্নতি, শারীরিক বলবৃদ্ধি এবং মনের প্রফুল্লতা, একথা কখন ভুলিবে না। ব্যায়ামবীর হইয়া যশোলাভ ইহার উদ্দেশ্য নয়। অনেক ছাত্র একটু ভাল ফুটবল খেলিতে পারিলেই নিজেকে গোষ্ঠ পাল বলিয়া মনে করিয়া খেলা লইয়া এমন মাতিয়া ওঠে, যে তাহার ফলে অন্য সব কর্তব্য একেবারে অবহেলিত হয়। অনন্যমনা হইয়া কেবল ফুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতির অনুশীলন লইয়া থাকিতে চায়, এরূপ ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের অনুকরণে সকলেই ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে, এমন কথা নাই। যাহারা তাহা করিবে, তাহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ মসীময় হইয়া যাইবে। খেলা খেলার জন্যই, উহা জীবনের কোন গুরুতর কর্মের স্থান লইতে পারে না। এক বিদ্যালয়ে দুইজন অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে একজন শুধু অধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তাঁহার বন্ধুটি খেলায় মত্ত হইয়া ক্রমশ অধ্যয়নে অমনোযোগী হইতে থাকেন। কলেজ ছাড়িয়া তিনি ব্যবসায় প্রভৃতিতে লিপ্ত হন এবং ক্রীড়া লইয়াই মত্ত থাকেন। ইহাতে তাঁহার সাংসারিক ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েন। একদিন একটি ট্রামে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে কথাচ্ছলে দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রথম বন্ধুকে বলেন, তোমার আর কি ? দু'ঘণ্টা পড়াও কি না পড়াও আর চেয়ারে বসে হাজার দেড় হাজার টাকা মাইনে পাও। তখন প্রথম বন্ধুটি বলিলেন, এখন আর ওসব কথা বলে লাভ

কি ? তুমি তো জান, তুমি যখন মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে দৌড়তে, তখন আমি বসে বসে আঁক কষতাম।

খেলাকে খেলা বা ব্যায়াম না মনে করিয়া উহাকে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার মনে করিয়া এবং উহার জন্য সময় ও শক্তির অপচয় করিয়া বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া থাকে। খেলা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু দিনের মধ্যে খেলা বা ব্যায়ামের জন্য কোনমতেই আধঘণ্টা বা একঘণ্টার বেশি ব্যয় করা কর্তব্য নয়। যাহারা পড়াশুনা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে কোন ম্যাচ খেলায় যোগ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। কারণ ম্যাচ খেলিতে গেলেই সময়ের মাত্রা ঠিক রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। ম্যাচ খেলার পূর্বে প্র্যাকটিস প্রভৃতিতে বহু সময় যায়। যদি ম্যাচ দূরে কোথায়ও খেলিতে হয়, তাহা হইলে যাতায়াত প্রভৃতিতে বহু সময় নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ম্যাচ খেলায় শরীরে গুরুতর আঘাত লাগিবারও সম্ভাবনা থাকে। এই সকল কথা ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া খেলা-সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহ সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। এ বিষয়ে কোন উৎসাহী বন্ধুর পরামর্শে কর্ণপাত করিবে না। অতিরিক্ত খেলার ফলে যখন তোমার অধ্যয়নের ক্ষতি হইবে, বা পরীক্ষার ক্ষতি হইবে, তখন কোন বন্ধুই তাহার প্রতিকার করিতে পারিবে না।

কোন কোন ছাত্র তাস খেলা, দাবা খেলা, পাশা খেলা, প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই খেলাগুলি ছাত্রজীবনের পক্ষে অতীব নিন্দনীয়। এগুলিকে পাপকার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ বৃদ্ধ বা অথর্ব হইয়া পড়িলে অনেক সময়ে এই সকল খেলায় প্রবৃত্তি জন্মে। অনেক সময়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা কেবলমাত্র সময়ক্ষেপণের জন্য এই সকল খেলা খেলিয়া থাকেন। কিন্তু ছাত্রজীবনে এই সকল খেলায় আসক্ত হওয়া অতীব গর্হিত অভ্যাস। এই সকল খেলায় সময়কে হত্যা করা

হয়, আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং অধ্যয়নে অমার্জনীয় অবহেলা জন্মে। যখন হিন্দু হোষ্টেলে ছিলাম, সেখানে একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিকে এবং আই. এস-সিতে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু হোষ্টেলে আসিয়া কয়েকটি দাবা-খেলার উৎসাহী ছাত্রের সহিত মিশিয়া এমন দাবা-খেলা আরম্ভ করিলেন, যে তাহার ফলে তাঁহার বি. এস-সি এবং এম. এস-সি'র ফল শোচনীয় হইয়া গেল। পরবর্তী জীবনের অনুতাপে কোনই প্রতিকার তিনি পান নাই।

ক্রীড়া ও ব্যায়াম শুধু শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার জন্য, একথা কখনও ভুলিও না। ঘরে বসিয়া তাস, পাশা, প্রভৃতি খেলা অতি গর্হিত কার্য, সর্বদা একথা মনে রাখিবে।

খাদ্য

খাদ্য সম্বন্ধে সকলেরই কিয়ৎ পরিমাণে সতর্কতা আবশ্যক। শরীর অসুস্থ হইলে খাদ্য ও পথ্যের পরিবর্তন করিতে হয়। এস্থলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক। সাধারণ সুস্থ শরীরে আমরা সাধারণ খাদ্যই খাইয়া থাকি। ছাত্রেরা বাড়ীতেই থাকুক বা হোষ্টেলেই থাকুক, তাহাদিগকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে থাকিতে হয়। সুতরাং বাড়ীর বা হোষ্টেলের যে সাধারণ খাদ্যব্যবস্থা, তাহাতেই অনেকটা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনমত উহার মধ্যেই কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন, ঘি, দই, রুটি বা লুচি, প্রভৃতি আমাদের সাধারণ খাদ্য। আমাদের শরীরের রক্ষা এবং পুষ্টির জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, যেমন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, ভিটামিন, প্রভৃতি, সেগুলি সবই উক্ত খাদ্যগুলির মধ্যে আছে। হোষ্টেলের খাদ্যতালিকার মধ্যে, সাধারণত দুধ, ঘি, মাখন, ডিম, প্রভৃতি থাকে না। সুতরাং প্রয়োজন বুঝিলে, এইগুলির জন্য সকালে বা সন্ধ্যায় নিজের জন্য কিছু পৃথক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সকালে ও বৈকালে জলখাবারের ব্যবস্থা, বাড়ীতেই হউক বা হোষ্টেলেই হউক, সকলের পক্ষে ঠিক এক প্রকার হওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়া থাকে। বয়স, স্বাস্থ্য এবং শারীরিক পরিশ্রম অনুসারে অনেক সময়েই খাদ্যের তারতম্য করিতে হয়। যে সকল ছাত্রেরা খেলাধুলা বা ব্যায়ামচর্চা করে, তাহাদের পক্ষে সারবান খাদ্য বেশি প্রয়োজন। ছোলাভিজা, রুটি, চিনি, মাখন, দুধ, ডাল, ডিম, প্রভৃতি ইহাদের পক্ষে প্রশস্ত। ধনী ব্যক্তির পুত্রেরা কিছু পেস্তা, বাদাম, আখরোট, প্রভৃতিও খাইতে পারে। তবে এই ধরনের খাদ্য বেশি খাওয়া ভাল নয়।

ছাত্রেরা সকালে ও বৈকালে লুচি, রুটি, পরটা, আলুর দম, মোহন-ভোগ, টোষ্ট, জ্যাম, মাখন, ডিম, কেক, পুডিং, কর্নফ্লেক, ওটমীল, দুধ, বিস্কুট, সন্দেশ, কলা, আপেল, আঙুর, পেঁপে, শশা, পেয়ারা, প্রভৃতি খাইতে পারে। বর্তমান কালে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা অতীব কঠিন। বাড়ীতেই হোক, বা হোষ্টেলেই হোক, নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য বুঝিয়াই খাদ্যনির্বাচন করিতে হয়। দুপুর ও রাত্রিবেলায় সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে কোন ছাত্রের পক্ষেই বেশি তারতম্য

করা সম্ভব হইবে না। তবে সকাল ও বৈকালে একটু চেষ্টা করিয়াই তাহাকে নিজ প্রয়োজন ও সামর্থ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

বাড়ীতে বা হোষ্টেলে জলখাবারের উপযুক্ত কয়েকটি প্রচলিত খাদ্যের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ফেনা-ভাত। ফেনসমেত নরম ভাত যে কোন চাউলেরই হইতে পারে। তবে নূতন মোটা আতপ চাউলের ফেনা-ভাতই বেশি সুস্বাদু। সুগন্ধি চাউল আরও ভাল। এই ভাত, আলুভাতে, বেগুনভাতে, সিমভাতে, পূর্বদিনের রাঁধা ও শুকাইয়া রাখা ডাল প্রভৃতির সঙ্গে খাইতে বেশ ভাল লাগে। একটু ঘি বা মাখন হইলে আরও ভাল হয়। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই ভাত অল্প করিয়া খাওয়াই ভাল।

খিচুড়ি। খিচুড়িও অতি উত্তম খাদ্য। সকাল অপেক্ষা বিকালের জলখাবারের পক্ষেই ইহা বেশি উপযোগী।

চিড়াভিজা বা চিড়া-সিদ্ধ। রুচি অনুসারে লবণ, চিনি, দুধ, দই, প্রভৃতি মিশাইয়া ইহা খাইতে বেশ ভাল।

সাবুর পায়স। সাবুর পায়স খাইতে সুস্বাদু এবং লঘুপাক। সাবুর দাম বেশি, তবে পায়স রাঁধিতে বেশি সাবুর প্রয়োজন হয় না।

মুড়ি। মুড়ি একটি উত্তম জলখাবার। লবণ ও তৈল মাখিয়া লঙ্কা সহযোগে মুড়ি খাওয়ায় আনন্দ আছে। বিস্কুট অপেক্ষা ইহা নিকৃষ্ট নয়। দুধ দিয়া, চিনি দিয়া, দই দিয়া, বা নারিকেল-কোরা দিয়া মাখিলে মুড়ি খুব সুস্বাদু হয়।

চিড়া। চিড়াও নানা প্রকারে খাওয়া যাইতে পারে। চিড়া জলে ভিজাইয়া চিনি বাতাসা, গুড় বা পাটালি দিয়া খাওয়া যাইতে পারে। ইহার সহিত দুধ বা দই থাকিলে আরও ভাল। সঙ্গে যদি আম, কলা

বা কাঁঠাল থাকে, তবে তো আরো ভাল। নারিকেল-কোরা ও চিনি মিশাইলে চিড়া-ভিজা খুব সুস্বাদু হয়।

চিড়ার পোলাও রান্না করা বেশ সহজ এবং খাইতে খুব সুস্বাদু।

আলু। আলু-সিদ্ধ একটি ভাল খাবার। ইহার সহিত লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া ও লেবুর রস মিশাইলে খাইতে খুব সুস্বাদু হয়। টম্যাটো বা মটরশুঁটির সহিত ইহা খাওয়া যাইতে পারে। সিদ্ধ আলু সামান্য একটু ঘিয়ে ভাজিয়া, গোলমরিচের গুঁড়া মিশাইয়া মুড়ির সহিত খাইতে বেশ ভাল লাগে। আলুর বড়া, আলুর চপ এবং আলুর পুরিও বেশ সুস্বাদু খাদ্য।

ঘুগনি। বড় মটর, ছোলার ডাল বা কড়াইশুঁটি সিদ্ধ করিয়া কিছু মসলা মিশাইয়া ঘুগনি প্রস্তুত করিলে খাইতে সুস্বাদু হয়। ইহার সহিত নারিকেলের কুচি বা কোরা মিশাইলে স্বাদ আরও ভাল হয়।

রুটি বা পুরি। হাতে গড়া আটার রুটি এবং মোটা পুরি উত্তম জলখাবার। এই রুটি বা পুরি চিনি দিয়া, গুড় দিয়া, ডাল দিয়া বা তরকারী দিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

লুচি বা পরটা। আজকাল ঘৃত অতি দুর্লভ। ভেষজ ঘৃত দ্বারা ভাজা লুচি বা পরটা গরম গরম খাইতে নেহাত মন্দ না হইলেও ইহা উত্তম খাদ্য নয়। তবে মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত ইহা খাওয়া যাইতে পারে।

ডালপুরি, আলুপুরি, ছাতুপুরি। এই খাদ্যগুলিতে সার আছে, অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং খাইতে ভাল। অল্প পরিমাণ খাইলেই জলখাবারের কাজ চলিয়া যায়। তবে এগুলি প্রস্তুত করিতে একটু সময় লাগে।

সুজি। সুজির পায়স বা মোহনভোগ (হালুয়া) একটি অতি

উপাদেয় খাদ্য। তবে একটু ভাল করিয়া রাঁধিতে গেলে কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা আছে। সাধারণভাবে রাঁধিলে ব্যয় তেমন বেশি নয়।

ডিম। ডিম একটি সারবান খাদ্য। হাঁস অপেক্ষা মুরগির ডিম বেশি সারবান, ইহাই সাধারণের ধারণা। শক্ত করিয়া সিদ্ধ করা ডিম পরিপাক করা কঠিন। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতাও হইতে পারে। খুব অল্প সিদ্ধ করিয়া, বা 'পোচ' করিয়া বা 'ওমলেট' করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। ডিম দ্বারা বা ইহার সহিত শশা মিশাইয়া ভাল স্যাণ্ডউইচ হয়। ডিম গুলিয়া তাহার মধ্যে পাউরুটির স্লাইস ফেলিয়া মাখাইয়া লইয়া ভাজিয়া লইলে খাইতে অতি চমৎকার হয়।

পাউরুটি। মাখন মাখাইয়া, জ্যাম বা জেলি মাখাইয়া, মরিচের গুঁড়া দিয়া, ভাজিয়া টোষ্ট করিয়া, চিনি দিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া রসে ফেলিয়া, পায়স রাঁধিয়া, প্রভৃতি বহুপ্রকরে পাউরুটি অতি সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়। কবি সুকুমার রায়ের মতে 'পাউরুটি আর ঝোলা গুড়' শিশুদের অতি প্রিয়।

রাঙালু। রাঙালু একটি পুষ্টিকর খাদ্য। রাঙালু পোড়াইয়া বা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায়। ইহা দ্বারা কয়েক প্রকার পিঠাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রাঙালু অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং ইহাতে অল্পেই ক্ষুধা মেটে।

গাজর। গাজরের হালুয়া বা পায়স খাইতে খুব ভাল।

চাল। চালের গুড়ার সরুচাকলি, চুষির পায়স, সাধারণ পায়স, প্রভৃতি যেমন সুস্বাদু তেমনি সারবান।

ডাল। ডালের বড়া, পেয়াজের বড়া প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য। মুড়ির সহিত বা ভাতের সহিত এই সকল খাদ্য খাইতেও বেশ ভাল লাগে।

তরকারি। আমরা যে সকল তরকারি রান্না করি, তাহার অনেকগুলি দিয়া ভাল খাবার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তবে এই সকল খাদ্য প্রস্তুত করিতে একটু সময় লাগে। মোচার চপ, ইঁচড়ের চপ, কড়াইশুঁটির চপ, প্রভৃতি খাইতে বেশ মুখরোচক। এগুলির খাদ্য মূল্যও কম নয়।

ছোলা, মুগ, মটর। এইগুলি ভিজাইয়া রাখিয়া পরে চিনি বা গুড় দিয়া খাইলে বেশ ভাল লাগে। ছোলা একটু বেশি সময় ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে সরু সরু গাছ বাহির হয়। উহাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন থাকে। প্রাতঃকালে খানিকটা ছোলা ভিজা খাইলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়।

ফল। ফল বলিতে বেদানা প্রভৃতি রোগীর পথ্যের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু তাহা নহে। বাজারে যখন যে ফল পাওয়া যায়, তাহাই খাওয়া যাইতে পারে। টমাটো অনেক সময়ে খুব সস্তা হয়। তখন প্রচুর পরিমাণে ইহা খাওয়া যাইতে পারে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কলা, শশা, ফুটি, পেয়ারা, আম, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সস্তা হইয়া থাকে। তখন এগুলি খাওয়া যাইতে পারে। শুধু ফল দ্বারা জল-খাবারের কাজ হইবে না। অন্য খাবারের সঙ্গে কিছু ফল খাওয়া যাইতে পারে।

ডালমুট, চীনাবাদাম, পাপর। এগুলি খাইতে মুখরোচক। এগুলিতে সারও আছে। তবে, এগুলি দ্বারা পুরা জলখাবার হইতে পারে না। কারণ এই ধরণের ভাজা জিনিষ পরিপাক করা কঠিন। বেশি খাইলে অসুখ করিতে পারে।

একটু চিন্তা করিলে এই তালিকার বাহিরেও অনেকপ্রকার জল-খাবারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

বাজারের প্রস্তুত খাদ্য বা মিষ্টান্ন যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত খাদ্যের মূল্য বেশি এবং তাহা বাসি এবং অপরিচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কাও থাকে।

যখনই যে খাবার খাইবে, অতিরিক্ত পরিমাণে খাইবে না। দুবেলা ভাত খাইবার সময়েও পেট একেবারে ভরিয়া উঠিবার একটু পূর্বেই খাওয়া শেষ করিবে। কখনই এমন করিয়া খাইবে না, যাহাতে খাইয়া উঠিয়া হাঁসফাঁস করিতে হয় বা অন্য কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ হয়।

খাইবার সঙ্গে সঙ্গে জল খাইবে না। একটু জল অবশ্য কাছে রাখিবে। বেশি তৃষ্ণা পাইলে বা বিষম খাইলে, একটু জল খাইবে। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশি জল খাইলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। খাওয়ার দুই তিন ঘণ্টা পরে খানিকটা জল খাওয়া ভাল।

আহার বিষয়ে অত্যন্ত সংযম আবশ্যক। ছাত্রজীবনে বয়স কম থাকে। সকল বিষয়েই আতিশয্যের আশঙ্কা থাকে। একটু কম খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশি খাইলেই শরীরের ক্ষতি হয়। বেশি মুখরোচক নানাবিধ মশলা ও তৈল ঘৃত দিয়া রাঁধা দ্রব্যাদি খুব কম খাইবে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, আমরা আমাদের দাঁত দিয়াই আমাদের কবর খনন করিয়া থাকি। অর্থাৎ অপরিমিত আহারের ফলেই আমাদের আয়ুষ্কাল কমিয়া যায়। এইজন্য ছাত্রজীবনে সর্বদা ভোজন বিষয়ে অতি সতর্কতা অবলম্বন করিবে। মনে রাখিও, শরীর রক্ষা ব্যতীত শুধু ভোজনেরই এবং জিহ্বাতৃপ্তিরই একটা আনন্দ ও তৃপ্তি আছে। কিন্তু অতি ভোজনের দ্বারা স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে সেই আনন্দও অন্তর্হিত হইবে।

চা, কফি, প্রভৃতি পানীয় শরীরের পক্ষে উপকারী নহে। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে, যাহারা নিয়মিতরূপে এবং অত্যধিক পরিমাণে এই সকল

পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত তাহাদের পাকস্থলীর এবং উদরের নানা প্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই সকল পানীয় সর্বদা বর্জন করিবে।

পান এবং তামাকও অনাবশ্যক খাদ্য। মুখগহ্বর এবং দন্তরাজি পরিষ্কৃত ও সুস্থ রাখিতে পানের কিছু উপকারিতা হয়তো আছে। কিন্তু নিয়মিত দাঁত মাজিবার অভ্যাস যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে আর পানের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তামাক বা তামাক হইতে প্রস্তুত অন্য কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। ছাত্রগণের পক্ষে ইহা স্পর্শ করাও অন্যায়।

তামাক সম্বন্ধে দুইটি উদ্ধৃতি নীচে দিলাম। এগুলি সর্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমস্ বলিয়াছেন—'It (smoking) is a custom loathsome to the eye, hateful to the nose, harmful to the brain, dangerous to the lungs, and the black fume thereof nearest resembles the horrible stygian smoke of the pit that is bottomless.'

টড বলিয়াছেন—'All experieneed people will tell you that the habit of using tobacco in any shape, will soon render you emaciated and consumptive, your nerves shattered, your spirits low and moody, your throat dry and demanding stimulating drinks, your persom filthy and your habits those of a swine.'

একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, যদি ধূমপায়ীদের ফুসফুস কাটিয়া কাহাকেও দেখান যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি জীবনে আর কখনও ধূমপান করিতে চাহিবে না।

সংযম

সংযম মানবচরিত্রের একটি অতি মহৎ গুণ। ছাত্রজীবনে এই গুণের অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। কোন বিষয়েই উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করা কর্তব্য নয়।

প্রথমেই খাদ্যের কথা বলা যাইতে পারে। খাদ্যের প্রতি অতিরিক্ত লোভ ছাত্রজীবনের একটি অতি সাধারণ দোষ। বহু ছাত্র প্রয়োজনীয় এবং হিতকারী খাদ্য গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা নানা প্রকার মুখরোচক খাদ্য বিবিধ শ্রেণীর হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকান প্রভৃতিতে খাইয়া থাকে। এগুলির মূল্য খুব বেশি। ইহাতে বহু অর্থ অপব্যয় হয়। তা ছাড়া এগুলি অনেক সময়েই শরীরের পক্ষে অপকারী। সুতরাং এই সকল খাদ্য খাইয়া অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই ক্ষতিসাধন করা নিতান্ত অন্যায়। খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কেও সংযম আবশ্যক। অতিভোজন অত্যন্ত কদভ্যাস। হিন্দু হোষ্টেলে একজন ছাত্র ছিলেন, তিনি সেই সুলভ খাদ্যদ্রব্যের দিনেও মাসে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার শুধু জলখাবারই খাইতেন। সেই খাদ্যের বর্তমান মূল্য দুই শত টাকার কম হইবে না।

আহারের অসংযমে ছাত্রজীবনে অভ্যস্ত হইলে পরে ইহার সংশোধন অতি কঠিন। ইহার ফলে পাকযন্ত্রের বিবিধ প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। এবং পরে ইহা হইতে অন্য বহুবিধ গুরুতর পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে। আহার সকলেরই প্রয়োজন। খাদ্য সুস্বাদু এবং পর্যাপ্ত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু খাদ্যের প্রতি অতিলোভ অতি নিন্দনীয়।

নিদ্রা সম্বন্ধেও সতর্কতা আবশ্যক। প্রতিদিন পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও সুনিদ্রা আবশ্যক। কিন্তু অতিরিক্ত নিদ্রা ভাল নয়। ইহাতে আলস্য

বৃদ্ধি পায়, কর্মে অনিচ্ছা জন্মে, পরিশ্রম করিবার অভ্যাস কমিয়া যায়। সুতরাং অতিনিদ্রাকে কখনই প্রশ্রয় দিবে না।

ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে, বাক্‌সংযম একটি প্রয়োজনীয় অভ্যাস। অতিরিক্ত কথা বলাকে প্রগল্‌ভতা বলে। কাহারও সহিত কথা বলিবার সময়ে বক্তব্য সব কথা গুছাইয়া বলিবে, কিন্তু একাদিক্রমে অবান্তর অতিরিক্ত কথা বলিবে না। কাহারও সহিত তর্ক বা আলোচনার সময়েও মূল বক্তব্যের বিষয় সর্বদা মনে রাখিয়া সংযত হইয়া কথা বলিবে। সাধারণ কথাবার্তা বা গল্প করিবার সময়েও নিজের সংযম হারাইবে না। মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকার কথা একের পর এক বলিয়া যাওয়া অতি কদভ্যাস। ইহাতে সময়ের অপচয় হয়, বৃথা বাক্যব্যয়ের কদভ্যাস অর্জিত হয়।

মনের সর্বপ্রকার ভাব ও চিন্তা বাহিরে প্রকাশ করিবার সময়ে বিশেষ সংযত হইবে। কোন প্রকার অসংগত লোভকে প্রশ্রয় দিবে না। লোভ সকলের মনেই আছে। চারিদিকে লোভনীয় বস্তুর অভাব নাই। নিজের মনে নিজের অবস্থা এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তু সংগ্রহ করিয়াই মনের সন্তোষ বিধান করিবে। কখনই অন্যের কোন বস্তু বা ঐশ্বর্য দেখিয়া নিজের মনে লোভের সঞ্চার হইতে দিবে না। লোভ আমাদের মনের একটি দুর্দম রিপু। সর্বদা ইহাকে সংযত ও দমিত করিতে হইবে।

মনের আর একটি দুর্দান্ত রিপু ক্রোধ। মনকে কখনই ক্রোধে আচ্ছন্ন হইতে দিবে না। কোন স্বল্প কারণে ক্রোধের উদয় অতীব নিন্দনীয়। মনকে সর্বদা শান্ত রাখিবে। ছাত্রজীবনে ও যৌবনে মনের শক্তি থাকে প্রচুর। এই প্রাচুর্য একদিকে যেমন মানুষকে উন্নতির

পথে লইয়া যায়, তেমনি এই শক্তি সংযত ও সংহত না হইলে মানুষের বিবিধ অবনতি ঘটায়। মনে ক্রোধের উদয় হইলেই ইহার স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়। তখন শুধু যে মুখ দিয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় কথা বাহির হয়, তাহা নহে, ক্রোধের বশে অত্যন্ত অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তি প্রায় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির মত। উহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্রোধের বশে অন্যায় কার্য করিয়া ফেলিলে পরে অনুতাপ করিয়া তাহার প্রতিকার করা যায় না। ছাত্রজীবনে মানুষের মন বিবিধ প্রকার জ্ঞান-অর্জনে লিপ্ত থাকে। এই সময়ই মনের বিবিধ গুণ অর্জন এবং দোষ বর্জন করিবার অভ্যাস ও শিক্ষা করিবার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

ছাত্রজীবনে অনেক সময়ে মনে নানা প্রকার অহংকারের উদয় হইতে পারে। যে ছাত্রের পিতা ধনী, সে স্বভাবতই ভাল খায়, ভাল পরে, শরীরের যত্ন উপলক্ষ করিয়া বিবিধ প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করে। ইহার পক্ষে মনে মনে অহংকার পোষণ করা এবং অন্য অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ ছাত্রদিগকে হীন চক্ষে দেখা সম্ভব বা স্বাভাবিক হইলেও, এই মনোভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে। অহমিকা কোন অবস্থাতেই ভাল নয়। ইহাতে মন অত্যন্ত হীনতা প্রাপ্ত হয়। অহংকারী ব্যক্তিকে কেহই শ্রদ্ধা করে না। কেহই তাহাকে আপন জন বলিয়া মনে করিতে পারে না। নিজেকে কখনই কাহারও অপেক্ষা বড় মনে করিবে না। কোন কোন ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিলে একটু অহংকারী হইয়া পড়ে। ইহা অতীব বিসদৃশ। অহংকার জন্মিলে বিদ্যার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। মনকে সর্বদা শান্ত রাখিতে হইবে। কোন প্রকার অহংকারকে মনে স্থান দিবে না। জ্ঞান অসীম। ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডারে যে জ্ঞান সঞ্চিত আছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র একটি কণাও আমরা আয়ত্ত

করিতে পারি না। সুতরাং উহা লইয়া গর্বের কি আছে? প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানের বা বিদ্যার গর্ব করেন না।

ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা মনের একটি গুরুতর দোষ। অতি যত্ন-সহকারে এই দোষ পরিহার করিবে। সংযত আত্মতৃপ্ত মনে এই দোষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। অন্যের সুখে বা সমৃদ্ধিতে কখনই মনের কোণে বেদনাবোধ করিবে না। সংসারের সকলের প্রতি সমান সৌহার্দ রাখিতে চেষ্টা করিবে। পরশ্রীকাতরতা মনের একটি কুৎসিত রোগ। ইহাকে কখনই প্রশ্রয় দিবে না।

ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সরল শুভ্র মনের পরম শত্রু। এই সকল রিপু যাহাতে মনকে কলঙ্কিত, ভারাক্রান্ত ও আবিলতা-পূর্ণ করিয়া না তুলিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবিবে। এই সকল রিপু দমন করিতে না পরিলে নিজের মনে শান্তি পাইবে না এবং পরের মনেও শান্তি দিতে পারিবে না। ছাত্রজীবনে বিবিধ রূপে মনের বিকাশ হইতে থাকে। এই সময়েই ইহাকে সর্বতোভাবে অনাবিল ও নিষ্কলুষ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

যাহার মন সংযত ও শান্ত, যাহার মনে ক্রোধ ও লোভের আধিক্য নাই, যে পরের দুঃখে দুঃখ এবং পরের সুখে সুখ অনুভব করে, তাহার মন অতি উন্নত বুঝিতে হইবে। সামাজিক সকল প্রকার ব্যবহারে ইহাদের বিনয় ও শিষ্টতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বয়ঃকনিষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের সহিত সবিনয় ও শিষ্ট ব্যবহার অভ্যাস করিবে। কাহাকেও কোন কারণে রূঢ় কথা বলিবে না। ক্রোধ, অহংকার, প্রভৃতি মনে না থাকিলে শিষ্ট ও বিনীত হইতে কষ্ট হইবে না। বিনয় ও শিষ্টতা অভিনয়ের ব্যাপার নহে। মনের গঠনই এরূপ হইবে, যাহাতে কখনও দুর্বিনীত ব্যবহার সম্ভব

না হয়। অন্যের দুর্বিনীত ব্যবহার সত্ত্বেও নিজে যথাসম্ভব সংযত থাকিতে চেষ্টা করিবে।

স্কুলে বা কলেজে কোন কারণেই ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে অবিনীত বা অশিষ্ট আচরণ করিবে না। ইহা প্রকৃত শিক্ষার একান্ত পরিপন্থী। কখনই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বা দল সৃষ্টি করিয়া গুরুজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে না। এই সকল কার্য অতি নিন্দার্হ। বাদ, প্রতিবাদ, অভিযোগ প্রভৃতি যাহাই কর না কেন, ধীরভাবে শান্তভাবে ভদ্রভাবে শিষ্টভাবে করিবে। অশিষ্ট ব্যবহার কোনমতেই সমর্থনীয় নহে। ইহা অত্যন্ত অসংযত মনেরই পরিচায়ক।

সময়ের মূল্য

মানবজীবনের সকল কর্তব্যেরই সময় সীমাবদ্ধ। কেহই অনন্তকাল জীবিত থাকে না। যে সময় আমরা জীবিত থাকি বা কর্মক্ষম থাকি, তাহার মধ্যেই আমাদের ঈপ্সিত কর্ম সম্পন্ন করিতে চাই। কিন্তু কর্মের অন্ত নাই, সাধনার অন্ত নাই, আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং সময়ের অপব্যবহার করিলে বহু কর্ম অসম্পন্ন হইবে, বহু সাধনা নিষ্ফল হইবে, বহু আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে।

সময় অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কাহারও কোন প্রকার অনুনয় বা প্রচেষ্টা ইহার অবিরাম গতি প্রতিহত করিতে পারিবে না। এই সময়ের একটি মুহূর্তও একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া পাইবে না। অর্থ অপচিত হইলে পুনরায় উহা অর্জন করা যাইতে পারে, কিন্তু

অপচিত সময় চিরদিনের মত চলিয়া যায়, আর কখনো ফিরিয়া আসে না। এই অতি সামান্য ও সহজ কথা আমরা সকলেই বুঝি, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই আমরা অনেকেই এই মহামূল্য বস্তুটির প্রতি একান্ত অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকি।

প্রতিদিন আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি স্বাভাবিক কর্তব্যগুলি বাদ দিলে যে সময় অবশিষ্ট থাকে, সে সময়েরও কতকাংশ সাংসারিক বিবিধ কর্তব্যপালনে অতিবাহিত হয়। ছাত্রজীবনের কথা মনে করিলেও দেখা যাইবে, স্কুল বা কলেজে অবস্থান, ট্রাম বাসে ভ্রমণ, প্রভৃতি কতকগুলি নিয়মিত কাজে অনেক সময় যায়। তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেটুকুরও যদি সদ্ব্যবহার না করা যায়, তাহা হইলে অধ্যয়নাদি কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে পারে না। সময়ের অপব্যয়ের মূল কারণ আলস্য এবং অবান্তর কার্যে আসক্তি। এইগুলি পরিত্যাগ না করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যাইবে না। ছাত্রজীবনই সর্বপ্রকার সদভ্যাস অর্জন এবং অসদভ্যাস বর্জন শিক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট সময়।

আহারাদি স্বাভাবিক অবশ্যকরণীয় কার্যে যে সময় যায় এবং স্কুল কলেজে অবস্থান ও যাতায়াতে যে সময় যায়, তাহা বাদ দিলে আট ঘণ্টার বেশি সময় অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং যদি কেহ প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাল অপব্যয় করে, অর্থাৎ আলস্যে, বিনাকার্যে, অযথা নিদ্রায় বা অবান্তর নিষ্প্রয়োজন কার্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে দিনের এক-অষ্টমাংশ সময় নষ্ট হইয়া যায়। এমনি করিয়া এক বৎসরের অষ্টমাংশ নষ্ট হইবে এবং এই অভাস পরিত্যক্ত না হইলে সমস্ত জীবনের এক-অষ্টমাংশ অপচিত হইবে। যদি ধরা যায়, সাধারণ মানুষের কর্মজীবন ষাট বৎসর, তাহা হইলে সম্পূর্ণ সাড়ে সাত বৎসর একেবারেই বিনষ্ট হইবে। ইহা হইল, এক ঘণ্টার অপচয়ের ফল। যদি দুই ঘণ্টা

সময় আলস্যে বা অকাজে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে একটি জীবনের পূর্ণ পনের বৎসর-কাল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। জীবনের এক-চতুর্থাংশ বিনষ্ট হওয়া কি ভয়ানক পরিতাপের কথা, তাহা দৈনিক দুই ঘণ্টা অপচয় করিবার সময়ে আমাদের মনে থাকে না। আমরা সাধারণতঃ যে কাজ করি, সময় অপচিত না হইলে, তাহা অপেক্ষা কত বেশি কাজ করিতে পারি, তাহা আমাদের মনে থাকে না।

আমাদের যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটিতে পারে, বা যে-কোন সময়ে গুরুতর অসুস্থ হইয়া অক্ষম হইয়া পড়িতে পারি, সে কথা অনেক সময়েই আমাদের মনে থাকে না। ছাত্রজীবনে অনেক ছাত্র, অনেক সময় আছে, এই কথা মনে করিয়া অনেক অধ্যয়ন এবং অনেক কার্য ফেলিয়া রাখে। পরে হয়তো স্বাস্থ্যহানির জন্য বা অন্য আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া তাহার পূর্বকল্পিত কার্য বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ছাত্রেরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কতখানি সময় তাহারা আলস্যে বা বৃথা কাজে অপচয় করিয়াছে। সামান্য একটু হিসাব করিলেই বুঝিতে পারিবে এই অপব্যয়ের ফলে কতখানি কার্য নষ্ট হইয়াছে! আমাদের জীবনকাল যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি ছাত্রজীবনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এই সময়টুকুই ছাত্রদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহার পরে বহু সাংসারিক ও সামাজিক দাবি আসিবে তাহাদের সময়ের উপর। সুতরাং এই সময়টিকে তাহারা যথাযথভাবে কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত করিলে, ছাত্রজীবনের সাফল্য প্রাপ্ত হইবে এবং সময়ের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার অভ্যাস আয়ত্ত হইলে ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহাদের সাধনা ফলবতী হইবে।

তোমরা মধ্যে মধ্যে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিবে। দেখিতে পাইবে ঘড়ির কাঁটাগুলির সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া কালস্রোত প্রবাহিত

হইতেছে। যে মুহূর্তটি চলিয়া গেল, কস্মিন্‌কালেও তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। যে মুহূর্তটি আলস্যে বা অবহেলায় চলিয়া গেল, সে তোমার জীবন হইতেই একটি মুহূর্ত লইয়া গেল। তাহা আর কখনও ফিরিয়া পাইবে না। কিছুদিন একটু চেষ্টা করিয়া সময়ের প্রতি মনোযোগী হইলে, দেখিতে পাইবে তোমার কাজকর্মের ও পড়াশুনার সময় কত বাড়িয়া গিয়াছে। যাহারা সময়ের মূল্য বোঝে, তাহাদের কখনও সময়ের অভাব হয় না। যাঁহারা সময়ের মূল্য বুঝিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন তাঁহারা যে কত বেশি কাজ করিতে পারেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অনেক সময়ে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়, কেমন করিয়া ইঁহারা এত অল্প দিনে এত বেশি কাজ করিলেন!

দেশের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, তাঁহারা কখনও সময়ের অপচয় করেন নাই। অনেক সময়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এত লিখিলেন কেমন করিয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিরলস সাহিত্য-সাধনার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাই বলিবেন, তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বহু যুবকও করে না।

যে সকল ছাত্রের সময়ের ব্যয় সম্পর্কে শিথিলতা আছে, তাহাদের কর্তব্য সযত্নে এবং সত্বর ইহার প্রতিকার করা। দিনের শেষে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেই তাহারা দেখিতে পাইবে কখন কোন সময় তাহারা বিনা কাজে ব্যয় করিয়াছে। ইহা দেখিয়া পরদিন পুনরায় ঐরূপ অবহেলা না হয় সেজন্য যত্নবান হইতে হইবে। দিবাভাগের কোন সময়ই প্রয়োজনীয় কার্য ব্যতীত শুধু শুধু বা অবান্তর কার্যে যাহাতে ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। যে কোন সদভ্যাস বা সৎকার্য করিতে মনে দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। একবার দৃঢ় সংকল্পের

সহিত অগ্রসর হইলে ক্রমশ মনোবল বাড়িবে এবং বৃথা কালক্ষেপের অভ্যাস থাকিলে তাহা বিদূরিত হইবে। কর্মঠ জীবনে অভ্যস্ত হইলেই দেখিবে, কর্ম না করিয়া বৃথা কালক্ষেপে আর প্রবৃত্তি হইবে না।

আমাদের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। অথচ কর্তব্য কর্মের সীমা নাই। ছাত্রজীবন সম্বন্ধেও সেই কথা। অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের কোন সীমা নাই। এই অসীম কর্তব্যের বোঝা বহিতে সময়ের অপব্যবহার করিবার সুযোগ কোথায়? যাহারা কর্তব্য ফেলিয়া অকর্তব্য কর্মে সময় অতিবাহিত করে তাহারা নিজেদেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে। ছাত্র-জীবনে সময়ের মূল্য না বুঝিবার ফলে কত ছাত্রের ছাত্রজীবন এবং পরবর্তী জীবন তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আনন্দ

ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই মুখ্য কর্তব্য। অধ্যয়নই তপস্যা। সর্বদা একথা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু এ কথার অর্থ ইহা নয় যে মনটাকে সর্বদা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিতে হইবে। অধ্যয়ন-তপস্যা উদ্‌যাপন করিতে হইবে বলিয়া মন নীরস ও নিরানন্দ হইয়া যাইবে অথবা দিবারাত্র অধ্যয়নের গুরুভার বহিতে বহিতে সাংসারিক ও সামাজিক জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইবে, এমন কথা নাই। যে ছাত্র অধ্যয়ন বিষয়ে যত বেশী মনোযোগী তাহার পক্ষে অন্যান্য কার্য হইতে তত বেশি বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এবং সত্যই যাহার মনে অধ্যয়ন ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা নাই, তাহার পক্ষে অধ্যয়নের

মধ্যেই আনন্দ ও প্রফুল্লতার সন্ধান মিলিবে। বাহিরের কোন প্রকার অবান্তর আনন্দপ্রচেষ্টা সে করিবে না। অধ্যয়নেই সে আনন্দ পাইবে, অধ্যয়নেই তাহার মানসিক তৃপ্তি আসিবে। যত বেশি অধ্যয়ন করিবে, ততই তাহার জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাইবে এবং এই জ্ঞানলাভের আনন্দই তাহাকে প্রফুল্ল ও আত্মতৃপ্ত করিয়া রাখিবে। অধ্যয়ন-তপস্যার মধ্যে যে তন্ময়তা তাছে, তাহা অতি সূক্ষ্ম, অতি পবিত্র, অতি সুখকর। যে ছাত্র অধ্যয়নের মধ্যেই তাহার মনের সকল ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে, সে অতি ভাগ্যবান।

সাধারণ বহু ছাত্রের পক্ষে ঠিক সম্পূর্ণ তন্ময়তা সম্ভব না হইতে পারে। তাহার পক্ষে অন্য বিবিধ কার্যের মধ্যে মনের আনন্দ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ও বৈকালে কিছুক্ষণ খেলাধুলা স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন উপকারী, তেমনি মনের আনন্দ ও স্ফূর্তি লাভের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। সরস্বতী পূজা বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে মণ্ডপ-সজ্জা, প্রতিমা-আনয়ন, নৃত্যগীতাদির আয়োজন, নৃত্যগীত উপভোগ, নিমন্ত্রণাদি কার্য, ভোজনের আয়োজন, ভূরিভোজন, প্রভৃতি বিবিধ কার্যে প্রভূত আনন্দ আছে। এই সকল কার্যের সময়েও নিজ প্রকৃত কর্তব্য যে অধ্যয়ন তাহা কখনো ভুলিবে না। অতিরিক্ত উৎসাহের বশে অসংগত রূপে সময় ও শক্তির অপচয় করিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে।

মহৎ এবং অসাধারণ ব্যক্তির জন্মতিথি বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে অনেক সময়ে যে সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাতে বহু ছাত্র যোগদান করিয়া থাকে। ইহাতেও বিবিধ প্রকার আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও ছাত্রদিগকে অত্যন্ত সংযত হইতে হইবে। অতি-উৎসাহ দ্বারা অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় অত্যন্ত অন্যায়।

উক্ত প্রকার উপলক্ষ ব্যতীত আরও বহু ব্যাপারে বিবিধ প্রকার আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নববর্ষ-উৎসব, স্কুল বা কলেজের বার্ষিক উৎসব, প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মিলন-উৎসব, নূতন-ছাত্র-স্বাগত-উৎসব, অধ্যাপকের বিদায়-উৎসব, নিজ পল্লীতে বিবিধ সাংস্কৃতিক উৎসব, দেশের স্মরণীয় দিন-উপলক্ষে উৎসব, পল্লীর বা নগরের বিবিধ প্রকার ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের বিবিধ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিবিধ উৎসব, বিবাহ-জন্মতিথি-অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব, প্রভৃতি অগণিত উৎসব সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বা কর্ণধার অভিভাবকেরাই, কিন্তু এতদুপলক্ষে কাজকর্ম সবই প্রায়শ ছাত্রদিগকেই করিতে হয়। এতৎ-সংশ্লিষ্ট আনন্দ-উৎসবগুলিতেও অভিভাবকগণের সঙ্গে ছাত্রেরাও আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বৎসরের সবগুলি অনুষ্ঠান একত্র করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে অপরিমিত সময় এবং শক্তি ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ছাত্রজীবনের পক্ষে ইহা শুভ নহে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া পুস্তকের কীট হইয়া থাকা হয়তো সাধারণ ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু যথেচ্ছ-ভাবে সর্বপ্রকার আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান এবং তজ্জন্য সময় ও শক্তির অপচয় অত্যন্ত অন্যায়। এইরূপে সময় ও শক্তি ব্যয় করিলে শুধু যে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, তাহা নহে, ইহাতে মনের সংযম থাকে না, মন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং লঘুচিত্ততা দোষে দুষ্ট হয়। যাহারা এই সকল অবান্তর কার্যে বেশি উৎসাহী, তাহারা ক্রমশ অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়ে। বিবিধ প্রকার আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে করিতে উহা একটা অভ্যাসের মত হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে ছাত্রগণকে, বিশেষত নগরের ছাত্রগণকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে।

নগরে আনন্দানুষ্ঠানের অন্ত নাই। কেহ ইচ্ছা করিলে বৎসরের প্রতিদিনই এই সকল অনুষ্ঠান লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অত্যধিক আনন্দচর্চা বা অত্যধিক কলাচর্চা ছাত্রজীবনের পক্ষে মারাত্মক।

পূর্বেই বলিয়াছি, ছাত্রগণের পক্ষে অধ্যয়ন হইতে আনন্দসংগ্রহ করাই শ্রেষ্ঠ পথ। তৎসঙ্গে আরো বিবিধ প্রকারে আনন্দ ও স্ফূর্তি লাভ করা যাইতে পারে। যেমন, ছুটির দিনে কয়েকজন মিলিয়া কোথাও ভ্রমণ করিতে বা চড়ুইভাতি করিতে যাওয়া। ইহাতে একটি দিন বেশ আনন্দে কাটে।

কোন একদিন চিড়িয়া খানায় গিয়া নানা প্রকার জীবজন্তুর আকার, ব্যবহার প্রভৃতি দেখিলে মনে খুব আনন্দ হয়। অনেক সময়ে গড়ের মাঠে গিয়া কিছুকাল ভ্রমণ করিলেও মনে প্রসন্নতা আসে। আত্মীয় স্বজনের বাড়ী নিকটে থাকিলে, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারাও আনন্দিত হইবেন, তোমারও আনন্দ হইবে।

অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ থাকিলে বাহিরের অন্যান্য প্রকার আনন্দ-অনুষ্ঠানের প্রতি লোভ স্বতঃই কমিয়া যাইবে। এমন কোন আনন্দানুষ্ঠানে কখনো যোগ দিবে না, যাহাতে উহার প্রতি আসক্তি জন্মে বা একটা কদভ্যাসে পরিণত হয়। তাস, পাশা প্রভৃতি কতকগুলি খেলা আছে, যেগুলি দ্বারা সময়হত্যা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার লাভ হয় না। ছাত্রগণের পক্ষে এই সকল খেলা অতীব গর্হিত কার্য। এই সকল খেলার আনন্দ একটা বিকৃত কল্পনার বিলাস মাত্র। ছাত্রজীবন মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে এই সকল অত্যন্ত অন্যায় উপায়ে সময়হত্যা করা অতীব গর্হিত কার্য বলিয়া পরিগণিত।

মানবজীবনে এবং ছাত্রজীবনে কর্তব্যপালনের আনন্দই শ্রেষ্ঠ আনন্দ। আর যাহা কিছু তাহা অতি অপ্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক

ব্যাপার মাত্র। যে সকল কার্যে সাময়িক আনন্দ হয়, মন প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে, কদভ্যাস অর্জনের আশঙ্কা থাকে না, মাঝে মাঝে সেই সকল কার্য দ্বারাই অধ্যয়ন-পরিশ্রমের মধ্যে চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিবে। কোন প্রকার অসৎ কার্য বা অসৎ অভ্যাসের বশবর্তী হইবে না।

অবান্তর কার্য

প্রত্যেক মানুষেরই বিবিধ প্রকার কর্মস্পৃহা এবং বিবিধ প্রকার কর্মকুশলতা থাকে। এই সকল কার্য করিতে তাহার মনে ইচ্ছা জাগে, ইহার জন্য সময় ব্যয় করিতে উৎসাহ হয়। এই সকল কার্য অন্যায় বা অসংগত কার্য না হইলেও এই সকল কার্যের প্রতি অধিক অনুরাগ ছাত্রজীবনের পক্ষে শুভ নহে। ইহাতে বহু সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়। অনেক সময়ে অর্থও ব্যয়িত হয়।

গীতবাদ্য নিন্দনীয় বিষয় নহে। বহু ছাত্র আছে, যাহারা ভাল গাহিতে পারে। সুতরাং কিছু কিছু সংগীতচর্চা করিতে ইচ্ছা হওয়া ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে কিছু সময় হয়তো এজন্য ব্যয়িত হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহার জন্য অপরিমিত সময় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে অধ্যয়নের অতিশয় ক্ষতি হইবে। এই সকল অবান্তর কার্যের (hobby) বিপদ এই যে ইহাদের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহাদিগকে অবহেলা করিবার মত মনের সংযম অনেক সময়ে থাকে না। ক্রমশ অভ্যাসের ফলে একটু

পারদর্শিতা জন্মিলে আরও বিপদ। তখন বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই উৎসাহ দিতে থাকেন, এবং তাহার ফলে তাহার অধ্যয়নাদিতে মনোযোগ আরও কমিতে থাকে। এই বিপদ হইতে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করিবে। শুধু সংগীত লইয়া সমগ্র জীবন যাপন অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। স্থতরাং ইহার মোহে পড়িয়া নিজের অবশ্যকর্তব্য হইতে বিচ্যুতি অতীব অন্যায়। বাদ্যশিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। বাদ্যশিক্ষা করিতেও প্রচুর অবসর প্রয়োজন। যাহার এদিকে শক্তি বা প্রবণতা আছে, সে মাঝে মাঝে একটি বা দুইটি যন্ত্র (যেমন, হারমোনিয়ম বা বাঁশী বা এস্রাজ বা গীটার) কখন কখন বাজাইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসাহ সংগত নয়। নিজের অবশ্যকর্তব্য অধ্যয়নাদির কোনরূপ ব্যাঘাত হইবামাত্র এই সকল কার্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অনেক ছাত্র বেশ ভাল খেলিতে পারে। ফুটবল বা হকি বা ক্রিকেট বা টেনিস হয়তো ভাল খেলে। কিন্তু তাই বলিয়া খেলাটাকে কখনই বড় মনে করিবে না। একটু ভাল খেলিতে পারিলেই স্কুলে বা কলেজে ম্যাচ খেলিবার জন্য অনুরোধ আসে। অনেক সময়ে নিজে হইতেই ম্যাচ খেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। ম্যাচ খেলিতে গেলেই বহু সময় নষ্ট হইবে। কারণ শুধু নির্দিষ্ট ম্যাচ খেলিবার সময়টুকুই যে নষ্ট হয়, তাহা নহে। প্রাকটিস করিতে, যেখানে ম্যাচ খেলা হইবে সেখানে যাতায়াতে এবং বিবিধ প্রকার উদ্যোগ-আয়োজনে বহু সময় নষ্ট হইয়া থাকে। খেলা শুধু খেলা না হইয়া একটা গুরুতর কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। অধ্যয়ন যাহার কর্তব্য, তাহার পক্ষে এইরূপে সময় ও উৎসাহ ব্যয় করা কর্তব্য নয়। এস্থলে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ছাত্রদের ম্যাচখেলা উপলক্ষে সময় নষ্ট করিবার জন্য

কলেজের কর্তৃপক্ষও উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সকল ছাত্রকে স্কুলের বা কলেজের 'সুনাম' রক্ষা করিতে নিয়োজিত করেন অথচ ইহার জন্য তাহাদিগকে অধ্যয়ন হইতে বা পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, খেলার প্রতি উৎকট উৎসাহের ফলে কোন কোন ছাত্রের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার হইয়া যাইতে পারে, তাহা ছাত্র বা শিক্ষক কেহই সম্যক্ উপলব্ধি করেন না।

কোন কোন ছাত্র গীতবিদ্যায় কিঞ্চিৎ পারদর্শী হইলেই, সঙ্গীতকেই তাহার প্রধান কর্তব্য মনে করিতে আরম্ভ করে। দেশের যে সকল খ্যাতনামা সঙ্গীতপারদর্শী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পড়ে। খেলা সম্পর্কেও এই দুর্বলতা আছে। একটু ভাল খেলিতে পারিলেই দেশের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ্‌গণের সমকক্ষ হইবার বাসনা জাগে এবং অধ্যয়নে শিথিলতা আসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছাত্র ভাল ফুটবল খেলিতেন। ফলে পড়াশুনা এবং পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে প্রায় অবান্তর হইয়া উঠিল। ছয়মাস অন্তর বা এক বৎসর অন্তর হঠাৎ তাহাকে ক্লাসে দেখা যাইত। আমার যতদূর মনে পড়ে শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেই এই ছাত্রটি ছয় সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল। এরূপ উন্মত্ত ক্রীড়াপ্রীতি অনুকরণীয় নহে। ভাল খেলার জন্য দৈবাৎ কেহ কোন একটা অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরি পাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া অনেক ছাত্র খেলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অলীক আশার বশবর্তী হইয়া তাহারা খেলায় মত্ত হয় না। শুধু একটা বহুদিন অর্জিত কদভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না বলিয়াই।

ছাত্রজীবনে ক্রীড়া বা সংগীতচর্চার স্থান অতি সীমাবদ্ধ। যাহাদের নিতান্তই ইহার প্রতি প্রীতি আছে, তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে

যে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মনের প্রফুল্লতা রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার জন্য কখনো কখনো সামান্য কিছু সময় ব্যয় করা যাইতে পারে। কখনই ইহার মোহে প্রলুব্ধ হইবে না।

অনেক ছাত্র ভাল ড্রইং করিতে বা চিত্রাদি অঙ্কন করিতে পারে। ইহা একটি সদ্গুণ। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে বহু স্থানে ইহার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং ইহার চর্চা করা উত্তম কার্য। কিন্তু এজন্য আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মত অবিরত চিত্র-অঙ্কনে নিযুক্ত থাকা একান্ত অকর্তব্য। ইহাতে অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শিতা জন্মিতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট অধ্যয়নের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর হইবে। কারণ উত্তমরূপে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতে বহু সময় ও শ্রম আবশ্যক। সুতরাং ভবিষ্যতে একটি খ্যাতনামা শিল্পী হইব, এইরূপ একটা ভ্রান্ত মোহে আকৃষ্ট হইয়া নিজের অত্যাবশ্যক অধ্যয়ন বিষয়ে অবহেলা করা অত্যন্ত অসংগত হইবে।

তাস খেলা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, প্রভৃতি ছাত্রজীবনের পক্ষে অতিশয় গর্হিত অভ্যাস। এইগুলিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এই সকল কার্যে বা খেলায় মূল্যবান সময় কথনই নষ্ট করিবে না।

যে কোন কাজে কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মিলেই তাহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। কেহ ভাল অভিনয় করিতে পারিলে বা আবৃত্তি করিতে পারিলে, পুনঃপুনঃ এই কার্য করিতে স্পৃহা হয় এবং সেজন্য সময় নষ্ট হইতে থাকে। অভিনয় করিতে, নির্দিষ্ট দিনের অভিনয়ের পূর্বে বহু সময় প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করিতে হয়। সকলেই অবশ্য অভিনয় করে না। কিন্তু যাহারা করে, তাহাদিগকে এজন্য অতি গুরুতর মূল্য দিতে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই সকল কার্যে অধ্যয়নের বেশি ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভুক্তভোগী ছাত্র নিজের মনে খুব ভাল করিয়াই জানে, এই কার্যের জন্য তাহার কতখানি ক্ষতি হইতেছে! যদি কাহারও

মনে সত্যই অদম্য উৎসাহের উদয় হয়, তথাপি বৎসরে একবারের বেশি এই কার্যে যোগদান কোনমতেই বিধেয় নয়।

ছাত্রজীবনে নিজের মূল অধীতব্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রকার কার্যে যেমন পারদর্শিতা জন্মিতে পারে এবং তজ্জন্য সময় ও শক্তির অপব্যবহার হইতে থাকিলে সমূহ ক্ষতি হইতে পারে, তেমনি মনের মধ্যে নানা প্রকার অবান্তর চিন্তাতেও অনেক সময়ে অধ্যয়ন-প্রচেষ্টার ক্ষতি হয়। যখন যে বিষয় অধ্যয়ন করিবে, তখন তাহাই হইবে একমাত্র সাধনা। কোন প্রকার অবান্তর চিন্তা মনে স্থান দিবে না। অনেক সময়ে ছাত্রেরা বিবিধ সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বা বিবিধ প্রকার বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নানা প্রকার অবান্তর কল্পনা করিতে থাকে। হয়তো নানা প্রকার অসম্ভব আকাশকুসুম রচনা করিতে থাকে। সাময়িক ব্যাপার হইলে ইহার কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইহা বহুদিন স্থায়ী হইলে মনকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় বিব্রত হইয়া বর্তমান কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও অমনোযোগ আসিয়া পড়ে। মনে কর, কেহ বিজ্ঞান পড়িতেছ। কোনক্রমে মনে উঠিল, একটা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিলে বিশেষ অর্থাগম হইতে পারে। সম্মুখে দুই একটা দৃষ্টান্তও হয়তো দৃষ্টিগোচর হইল। এই ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের একটা অস্পষ্ট চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া বসিলে বর্তমান বিজ্ঞানপাঠে শিথিলতা আসিবে। এই প্রকার অলীক এবং অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ-কল্পনা হইতে মনকে মুক্ত রাখিবে। যখন যে অধ্যয়ন বিষয়ে নিযুক্ত রহিবে, প্রাণপণে এবং কায়মনোবাক্যে তাহাকেই একমাত্র সাধনা বলিয়া মনে করিবে। তবেই তোমার চেষ্টা এবং শ্রম সার্থক হইবে।

সৎসঙ্গ

মানবজীবনে সৎসঙ্গ একটি অমূল্য সম্পদ। জীবনের যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মঙ্গলময়, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, সকলই সৎসঙ্গ হইতে আমরা লাভ করিয়া থাকি। মানুষ তাহার পিতামাতা এবং পূর্বপুরুষগণ হইতে বিবিধ দোষগুণ লাভ করিয়া থাকে সত্য। কিন্তু তাহার জীবনের সমস্ত সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হয় এবং পূর্ণতালাভ করে সৎসঙ্গের মহিমায়। সৎসঙ্গ ব্যতীত মানুষের প্রকৃত কল্যাণলাভের আশা নাই। জীবনের সর্বাবস্থায় ইহা সত্য। শৈশবে, বাল্যকালে, কৈশোরে, ছাত্রজীবনে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে এবং বার্ধক্যে, সকল অবস্থায় এবং সকল বয়সেই একথা সম্পূর্ণ সত্য। ছাত্র-জীবনে মানুষের যে স্বাধীনতা থাকে, পরবর্তী জীবনে তাহা থাকে না। সংসারের আবর্তে পড়িয়া অনেক সময়ে অবাঞ্ছিত সংসর্গে আসিয়া পড়িতে হয় এবং তাহা দ্বারা সর্বনাশও সাধিত হয়। ছাত্রজীবনের স্বাধীনতার দিনে সৎসঙ্গ অর্জনের এবং অসৎসঙ্গ পরিহারের যথেষ্ট সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে।

সন্ন্যাসীপ্রবর শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সজ্জনসঙ্গ করিলে জীবন সার্থক হয়।

প্রচলিত কথায় আছে—

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস,
অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

মানবজীবনের সার্থকতার পক্ষে সৎসঙ্গ একান্ত অপরিহার্য। সৎসঙ্গ ব্যতীত মানুষ কখনই মানুষ হইতে পারে না। বাড়ীতেই থাক, বা হোষ্টেলেই থাক, সর্বদা চেষ্টা করিবে সৎ, পরিশ্রমী, অধ্যয়নশীল ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতে। সংযমী ছাত্রের সান্নিধ্যে তোমারও সংযমী হইবার চেষ্টা হইবে, পরিশ্রমী ছাত্রের সংস্পর্শে তোমারও শ্রমশীলতা বাড়িবে, অধ্যয়নশীল ছাত্রের সংসর্গে তোমারও অধ্যয়নশীলতা বাড়িবে। যাহারা সৎ, যাহাদের আদর্শ উচ্চ. যাহারা অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগী, তাহাদের সহিত পরিচয় করিবে, তাহাদের নিকট পরামর্শ লইবে, তাহাদের সদভ্যাসগুলি অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে। একটি আলো হইতে যেমন অনেক আলো জ্বালাইয়া লওয়া যায়, একটি জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক ব্যক্তি যেমন জ্ঞানের আলোক পাইয়া থাকেন, তেমনি একজন সজ্জনের নিকট হইতে অন্য অনেকে সদ্‌গুণাবলী অর্জন করিয়া থাকে।

গৃহ বা হোষ্টেল ব্যতীত যেখানে সৎলোকেরা বাস করেন বা সৎলোকেরা যাতায়াত করেন, সেখানে যাইবে। সৎ ব্যক্তির মুখের কথা, আলোচনা বা বক্তৃতা শুনিলে মনের মধ্যে সচ্চিন্তার উদয় হইবে, সৎচিন্তা এবং সৎকর্মের প্রতি আকর্ষণ আসিবে। যাঁহারা সত্যই সৎ ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট-সান্নিধ্য হইতে সৎপ্রেরণা পাওয়া যায়। অনেক ব্যক্তি কণ্ঠস্থ কবিতার মত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, অথচ সেই সকল উপদেশ বা আলোচনার সহিত তাহাদের স্বকীয় জীবনের সম্পর্ক প্রায় থাকে না। এই সকল ব্যক্তির নিকট গিয়া সময় নষ্ট করিবে না। সৎ বিষয়ে বক্তৃতা করিবার শক্তি অনেকের থাকিলেও সৎ জীবন যাপনের অভ্যাস সকলের নাই। যেখানে সেখানে যাহার তাহার বক্তৃতাদি শুনিতে গিয়া সময়ের অপব্যয় করিবে না।

উহাতে সৎসঙ্গ হয় না। যাঁহারা নিজেরা সংযত ও উচ্চ জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের কাছে যাইবে। ইঁহারা বেশি কথা না বলিলেও বা বেশি বক্তৃতা না করিলেও ইঁহাদের জীবনই শিক্ষকের কাজ করিয়া থাকে।

কথিত আছে স্পর্শমণিসংযোগে লৌহও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বর্গীয় পিতৃদেব একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

স্বর্ণায়ন্তে সহবসতিতঃ স্পর্শরত্নেন লৌহাঃ।

সেইরূপ সাধারণ আপাতগুণহীন ব্যক্তিও সজ্জনের সঙ্গগুণে গুণবান হইয়া উঠে।

নিজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকে উন্নতির জন্য সর্বদা মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিবে। এইরূপ ব্যক্তি হয়তো সর্বদা নিকটে পাইবে না। কিন্তু মনে ইচ্ছা থাকিলে সজ্জন ব্যক্তির সন্ধান পাইতে বেশি কষ্ট করিতে হইবে না। সজ্জন ব্যক্তিদের মধ্যেও সকলেই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন না হইতে পারেন। কোন বিশিষ্ট চরিত্রবান সাধু ব্যক্তি হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় পারদর্শী না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য তাহাতে ম্লান হয় না। ইঁহাদের সান্নিধ্যে তোমারও মনের ও চরিত্রের উন্নতি হইবে।

ইঁহাদের সহিত ধীরভাবে সকল বিষয় আলোচনা করিবে। মনের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা বা জটিলতা সৃষ্টি করিবে না। মন খুলিয়া সদালোচনা করিবে, পরস্পরের ভাব-বিনিময় করিবে। মনের অর্গল সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া সরলভাবে আলাপ-আলোচনা করিবে। ইহাতে মনের বল এবং মনের প্রসন্নতা বাড়িবে। এই সকল মহামনা ব্যক্তিদের সঙ্গে হয়তো সর্বদা সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যখনই সাক্ষাৎ হইবে তখনই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে ইঁহাদের সম্মুখীন হইবে এবং বিনীত ও ধীর

চিত্তে ইঁহাদের সাহচর্য করিবে। নিজেকে সৎপথে রাখিবার এবং সৎ জীবন যাপন করিবার পক্ষে সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

স্কুলে কলেজে বাড়ীতে এবং বাহিরে বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। বিশেষ কোন কার্যের জন্য ইহাদের সহিত পরিচয় হয়। এই সকল সম্পর্ক অতি বাহ্য, ইহার সহিত মনের কোন সম্পর্ক নাই। স্কুল কলেজের অধিকাংশ ছাত্রের সহিত সম্পর্কও অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও কাহারও কাহারও সহিত বেশি ঘনিষ্ঠতা হওয়া অসম্ভব নয়। স্কুলের এবং কলেজের বাহিরেও এইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইতে পারে। ইহাকেই সাধারণত আমরা বন্ধুত্ব বলি। বন্ধুর সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয়। সাক্ষাৎ হইলে আনন্দ হয়। তাহার সহিত মন খুলিয়া কথা বলা যায়, পরস্পরের শারীরিক বা মানসিক কষ্টে সহানুভূতি জন্মে। প্রকৃত বন্ধু হইলে পরস্পরের সুখে ও সাফল্যেও আনন্দলাভ হইয়া থাকে। অধ্যয়ন-বিষয়ে অন্য বিবিধ প্রকারে পরস্পরকে সহায়তা করিয়া থাকে।

এইরূপ প্রকৃত বন্ধুলাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। অতি কম ছাত্রের ভাগ্যেই এইরূপ প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলাভ ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ব কোন একটি বিশেষ ব্যাপার লইয়া সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, খেলার মাঠের বন্ধুত্ব, এক ঘরে বাস করার বন্ধুত্ব, একসঙ্গে অভিনয় বা কোন আনন্দানুষ্ঠানে যোগদানের বন্ধুত্ব, ইত্যাদি। এই সকল বন্ধুত্বের মধ্যে গভীরতা নাই, পরস্পরের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা নাই। এই সকল বন্ধুত্বের মোহে কখনো নিজের কর্তব্য বা নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিবে না। প্রকৃতপক্ষে এবং পরিণামে এই সকল বন্ধুত্ব হইতে ক্ষতি ব্যতীত লাভ হয় না। ইহার অর্থ এই নয় যে এই সকল ক্ষণ-বন্ধুদিগের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করিবে বা

তাহাদিগকে নিন্দা করিবে। এই সকল বন্ধুত্বে প্রলোভিত হইয়া নিজের অধ্যয়নাদির ক্ষতি করিবে না, ইহাই মনে রাখিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িবে। মনের মিল না হইলে বা আচরণ ও আদর্শ সৎ এবং উচ্চ না হইলে এই ঘনিষ্ঠতাকে কখনই প্রশ্রয় দিবে না। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সর্বদা মনে রাখিবে যে প্রকৃত সৎস্বভাব ব্যক্তিরই সাহচর্য বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ব্যক্তির সান্নিধ্যেই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে।

সৎসঙ্গলাভের একটি সহজ এবং প্রকৃষ্ট উপায় সদ্‌গ্রন্থপাঠ। সজ্জন সব সময়ে নিজের ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। কিন্তু সদ্‌গ্রন্থের কখনই অভাব হইতে পারে না। ছাত্রজীবনে সর্বদাই কিছু কিছু সদ্‌গ্রন্থপাঠ অভ্যাস করিবে। পাঠ্য পুস্তকগুলিও অসৎ নহে। কিন্তু তাহার বাহিরেও সৎ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে, অভ্যাস, আচরণ, চিন্তা এবং স্বভাব সুন্দর, সংযত ও সুস্থ রাখিতে সদ্‌গ্রন্থপাঠ অশেষ প্রকারে সহায়তা করিয়া থাকে। গীতা, উপনিষদাদি ধর্মগ্রন্থ মানসিক উন্নতি সাধনের পরম সহায়। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ করা কর্তব্য। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ভূদেব প্রভৃতি মহৎ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের জীবনচরিতপাঠে মহৎ জীবন অনুকরণের স্পৃহা জন্মে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল শক্তিমান ব্যক্তি তাঁহাদের কর্ম ও সাধনা দ্বারা সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধন করিয়াছেন, সেই সকল পূতচরিত্র ব্যক্তিগণের জীবনীপাঠে মনের শক্তি ও পবিত্রতা বর্ধিত হয়।

ঘরে বাহিরে পথে প্রবাসে কোথাও সদ্‌গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে। ইচ্ছা থাকিলে সর্বদা সর্বত্র সদ্‌গ্রন্থের সঙ্গলাভ করা যায়। যুগযুগান্ত ধরিয়া অগণিত মনীষীর সচ্চিন্তারাশি বিবিধ গ্রন্থরাজির মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। সুবিবেচনার সহিত নির্বাচন করিয়া সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে। নতুবা বহু

সময়ের অপচয় হইবে। যে সকল পুস্তক তোমার কোন সদ্‌বন্ধু বা অধ্যাপক পড়িয়াছেন এবং সত্যকার সৎপুস্তক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবে।

অসৎসঙ্গ

মানুষের জীবনে যত প্রকার দুর্ভাগ্য আছে, তাহার মধ্যে অসৎসঙ্গই বোধ হয় সর্বপ্রধান। সংসারে থাকিতে গেলে বহু প্রকার ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলের সহিতই বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যে কোন বয়সে, যে কোন অবস্থাতেই অসৎসঙ্গের কুফল ফলিয়া থাকে। তবে একবার চরিত্র সুগঠিত হইলে এবং ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে অনেক সময়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা সময়বিশেষে অসৎসঙ্গে পতিত হইলেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অল্পবয়সে এবং ছাত্রজীবনে অসৎসংসর্গের কুফল নিরোধ করা অতি কঠিন। সেইজন্য সর্বদাই অসৎসংসর্গ অতি সাবধানে পরিহার করিবে।

ছাত্রগণের মধ্যে যে সকল কদভ্যাস দেখা যায়, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সঙ্গদোষের ফল। অলস ছাত্রের সহিত অতি-ঘনিষ্ঠতা হইলে, নিজেও অলস হইয়া যাইবে। যাহারা খেলাধুলার জন্য অত্যধিক সময় নষ্ট করে, তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলে, তোমারও খেলাধুলায় আসক্তি বাড়িয়া যাইবে। তামাক-সেবনে অভ্যস্ত ছাত্রদের সহিত বন্ধুত্ব হইলে, তুমিও তামাক সেবন করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দু

হোষ্টেলের একটি মেধাবী ছাত্র দাবা-খেলায় আসক্ত কয়েকটি বন্ধুর বন্ধুত্বের আতিশয্যে দাবা-খেলায় অভ্যস্ত হইয়া নিজের অধ্যয়নে এমন উদাসীন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার বাকি সমস্ত পরীক্ষাগুলির ফল অতিশয় মন্দ হইয়া গেল। আর একজন মেধাবী ছাত্রের একটি অমানুষ বন্ধু জুটিয়া যায়। তিনি হোষ্টেলের বাহির হইতে অতি ঘৃণিত পানীয় পকেটে করিয়া আনিয়া বন্ধুকে পানদোষে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। এই অসদর্জিত অভ্যাসের ফল সমস্ত জীবন ভরিয়া তিনি ভোগ করিয়াছেন।

অসদভ্যাসে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের একটি মজ্জাগত দোষ এই যে তাহারা সর্বদাই তাহাদের অসৎ কর্মের বা অসৎ অভ্যাসের সহযোগী জুটাইতে চায়। কোন নির্দোষ ছাত্রকে বা বন্ধুকে তাহাদের অসদভ্যাসের আয়ত্তে আনিতে পারিলে তাহাদের মনে একটা পৈশাচিক আনন্দ হয়। কোন প্রকারে কেহ তাহাদের অসৎ কার্যের দলে আসিয়া জুটিলে তাহারা তাহার সর্বনাশের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

অসৎসঙ্গে পড়িয়া কোন বিশেষ একটি কদভ্যাস, যেমন ধূমপান প্রভৃতিতে অভ্যস্ত না হইলেও, অসৎ ব্যক্তির সাহচর্যে সমস্ত মন ও বুদ্ধি বিকৃত এবং অশুচি হইয়া যায়। অসৎ ব্যক্তির কথা, অলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পরামর্শ, উপদেশ প্রভৃতি সমস্তই অতি সাবধানে শুনিতে হইবে। এ সকল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। অসৎ ব্যক্তি হইতে বিবিধ প্রকার ক্ষতি ও আশঙ্কার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। একটি শ্লোক আছে—

হস্তী হস্তসহস্রেন শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিনো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ॥

এই কথাগুলি অতি মূল্যবান। দুর্জনের সান্নিধ্য পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য। দুর্জন যে শুধু তাহার কদভ্যাসসমূহ সংক্রামিত

করিয়া নিকটবর্তী বক্তিগণকে অসৎপথে লইয়া যায়, তাহা নহে, ইহারা অন্য বহু প্রকারে সজ্জন ব্যক্তিকে বিড়ম্বিত এবং বিপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকার অসৎসঙ্গ হইতে যত দূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল।

অসৎসঙ্গের একটি মারাত্মক বিশেষত্ব এই যে ইহার যেন একটি মোহিনী শক্তি আছে। একটু দুর্বল বা একটু ভাবালু বা একটু উদাসীন বা একটু নিঃস্বার্থ বা একটু সরল মন সহজেই অসৎসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ছাত্রসমাজে মিশিতে হইবে। মানুষের মন দুর্দমনীয় অশ্বের মত বিবিধ অন্যায়পথে ধাবিত হইতে চায়। অতি কঠোরভাবে এই অশ্বের মুখে বল্গা পরাইয়া ইহাকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। অসৎসঙ্গের প্রভাবে মনের এই সংযমশক্তি বিলুপ্ত হয়।

সদ্‌গ্রন্থ যেমন একটি পরম উপকারী বন্ধু, তেমনি অসদ্‌গ্রন্থ মানুষের পরম শত্রু। অসদ্‌গ্রন্থপাঠ অসৎসংসর্গের মতই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া মানুষের জ্ঞানবিস্তারে যেমন সাহায্য করিয়াছে, তেমনি অসৎ পুস্তক রচনা মুদ্রণ ও প্রকাশেরও সহায়তা করিয়াছে। হীনচেতা, ঘৃণিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মানবমনের নীচ, অসৎ, অশুচি প্রবৃত্তিগুলিতে ইন্ধন যোগাইবার উদ্দেশ্যে এবং মানুষের মনে পৈশাচিক আনন্দ সরবরাহ করিবার জন্য বিবিধ প্রকার কদর্য পুস্তক লিখিয়া থাকেন। এই সকল পুস্তক কখনো স্পর্শ করিবে না। সাহিত্যের দোহাই দিয়া, আর্টের দোহাই দিয়া অনেক লেখক নানা প্রকার অতি কুৎসিত বিষয় নির্লজ্জভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। অনেকে আবার শর্করামণ্ডিত তিক্ত ঔষধের মত বাহিরে একটু দয়া, মমতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবরণে তাঁহাদের মূল জঘন্য বক্তব্যগুলি একটু লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, অনেকের সেটুকু লজ্জাও

নাই। দেশী ও বিদেশী জঘন্য গ্রন্থগুলির অনুকরণে অনেকে নানা প্রকার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেগুলিও অতীব ঘৃণার্হ। এই সকল পুস্তক কখনো স্পর্শ করিবে না।

পুস্তকবিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক আশঙ্কার কারণ সাময়িক পত্রিকার অবাধ প্রকাশ ও প্রচার। অনেক সাময়িক পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ের এমন একটি খিচুড়ি প্রস্তুত হয়, যাহার মধ্যে উপনিষদের তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ঘৃণার্হ কদর্য রচনা পর্যন্ত সবই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গৃহে গৃহে, স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে সর্বত্র এই সকল খিচুড়ি-পুস্তকগুলি স্থান লাভ করিয়াছে। ছাত্রেরা এই পুস্তকগুলির মধ্যে বিষয়নির্বাচনের কোন চেষ্টা না করিয়া সকল প্রকার লেখাই গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। এই সকল পুস্তকের অসৎ প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে। সাময়িক পত্রিকার মধ্যেও আবার বহু পত্রিকা শুধু নানা প্রকার কুৎসিত ভাব-সম্বলিত রচনা প্রকাশ করিয়া মানুষের মনে কুৎসিত আনন্দ পরিবেষণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জাতীয় পত্রিকার সংখ্যা যেন ক্রমশই বাড়িতেছে। মনকে এগুলির অসৎ প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। অসৎসংসর্গের মতই এই সকল পুস্তকের সংসর্গও মনুষ্যত্বনাশী। সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা একান্ত আবশ্যক।

বর্তমান যুগের একটি সাংঘাতিক অভিশাপ কুরুচিপূর্ণ সিনেমার আবির্ভাব। অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক সিনেমাচিত্র বাদ দিলে অন্য অধিকাংশ সিনেমারই একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের মনের আদিম রিপুকে প্রশ্রয় দান এবং তাহারই উপাসনা। বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে হয়তো এইরূপ চিত্রাবলী দর্শনে অতিরিক্ত মানসিক চাঞ্চল্য হয় না, কিন্তু ছাত্রজীবনে এই সকল চিত্রদর্শন মানসিক অবনতির সহায় এবং কারণ

না হইয়া পারে না। স্কুল এবং কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সযত্নে নির্বাচিত এবং স্কুল এবং কলেজের মধ্যেই প্রদর্শিত সিনেমাচিত্র ব্যতীত অন্য কোন চিত্রদর্শন ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির পক্ষে হানিকর। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়াই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। চিত্রগুলির নির্মাতারা চিত্রের মধ্যে নানাবিধ দার্শনিক, সামাজিক, পারিবারিক, এমন কি নৈতিক উচ্চাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করিলেও মূলত এগুলি নানা প্রকারে মানুষের অতি স্থূল আনন্দবিধানের জন্যই নির্মিত হইয়া থাকে। চিত্রগুলির অন্তর্গত গল্পাংশ, সংলাপ, অভিনয়, প্রভৃতি এবং ইহার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সমস্তই অধিকাংশস্থলে মানুষের মনের হীন প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ছাত্রজীবনে এই সকল চিত্রের দর্শন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সংসারের অগণিত প্রকার অনিবার্য অসৎ প্রভাবের মধ্যে মানুষের নিজ-হাতে গড়া এই উৎপাত ছাত্রসমাজের অধঃপতনের একটি মুখ্য কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শত্রু হইতে ছাত্রগণকে সর্বদা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিবে, সম্পূর্ণ নির্বান্ধব হইয়া একাকী থাকাও বরং ভাল, কিন্তু কোন মতেই অসৎসঙ্গে থাকিবে না বা অসৎ গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিবে না। সুনির্বাচিত সৎশিক্ষামূলক বা তথ্যমূলক বা উচ্চাদর্শসমন্বিত চিত্র ব্যতীত অন্য প্রকার চিত্র ছাত্রদের পক্ষে বেশি না দেখাই মঙ্গল।

একটি সত্য বলিয়া প্রচারিত গল্প আছে। জনৈক তরুণ ছাত্র উত্তর কলিকাতার একটি চিত্রগৃহে নিকষিত-হেম রজকিনী-প্রেমের চিত্রে এমনই অভিভূত হইয়াছিলেন, যে একাদিক্রমে মাসাধিককাল প্রত্যহ ঐ ছবিখানি দেখিয়াও পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই ধরণের মোহ হইতে সর্বতোভাবে বিমুক্ত থাকিতে হইবে।

সেবা ও স্বদেশপ্রেম

ছাত্রজীবনের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্তব্য অধ্যয়ন। যে ছাত্র যত বেশি মাত্রায় নিজেকে অধ্যয়ন-তপস্যায় নিমগ্ন রাখিতে পারিবে, তাহার তত বেশি জ্ঞানলাভ হইবে, ছাত্রজীবন সার্থক হইবে। সুতরাং ছাত্রের পক্ষে অন্য কোন কার্যে ব্যাপৃত হওয়া সমীচীন নহে।

তথাপি ছাত্রসমাজে এবং সংসারে বাস করিতে গেলে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা সকল ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক ছাত্রই অধ্যয়ন ব্যতীত বাড়ীতে, হোষ্টেলে বা পল্লীতে অন্য প্রকার হিতকর কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল কার্যের মধ্যে সাধারণ সামাজিকতা একটি কর্তব্য। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করা অনেকের নিকট একটি আবশ্যকীয় অভ্যাস বলিয়া মনে হইবে। এরূপ সাক্ষাৎ ও আলাপ প্রভৃতি যে দূষণীয় তাহাও নহে। কিন্তু এইরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যহীন সাক্ষাতাদির কোন প্রকৃত মূল্য নাই। শুধু মৌখিক একটা পরিচয় ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই হয় না। অথচ এজন্য বহু সময়ের অপব্যয় হয়। বিবিধ প্রকার বিবিধ রুচির বিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত বহু বৃথালাপ করিতে হয়। বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত সহরে শুধু যাতায়াতেই বহু সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহু প্রকারের বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতাদি করিতে গিয়া সময়ের অপচয় করা কখনই কর্তব্য নয়। সুযোগ হইলে পণ্ডিত, জ্ঞানী, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাতাদি করা ভাল। কিন্তু শুধু শুধু বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ স্বভাবের ব্যক্তির সহিত দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করিলে নিজের কর্তব্যকর্মে অবহেলা হইবে।

কোন কোন ছাত্রের মনে, সকলের কাছেই প্রিয় হইব, এইরূপ একটা মনোভাব আসিয়া পড়ে। সকলের কাছেই প্রশংসা পাইব, সকলেই আমার সহিত আলাপ করিবে, গল্প করিবে, খেলিতে চাহিবে, সকল প্রকার কাজেই আমাকে ডাকিবে, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। ইংরাজিতে ইহাকে বলে পপুলারিটি। পপুলারিটি ছাত্রজীবনের কঠোর কর্তব্যপালনের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। নানা কাজে সময় নষ্ট করিলে নিজের অধ্যয়নের যে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার করিবার উপায় থাকে না। কদাচিৎ হয়তো মনে হয়, কোন ছাত্র স্কুল বা কলেজে বিবিধ প্রকারে পপুলার হইয়াও অধ্যয়নাদি যথাযথরূপে করিয়াছে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত যে শুধু বিরল তাহা নহে, একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে, এই সাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য তাহার বহু ক্ষতি হইয়াছে।

পপুলারিটি বা জনপ্রিয়তার লোভে অধ্যয়নের ব্যাঘাত করিবে না, একথার অর্থ ইহা নয়, যে কাহারও সহিত আলাপ করিবে না, বা সদ্ব্যবহার করিবে না, বা কোন সৎকার্যে যোগ দিবে না। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নের সময় নষ্ট করিয়া বিবিধরূপে নানা জনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয়, ইহাই মনে রাখিবে।

পরস্পরের সহিত সৌহার্দ, রোগে, শোকে, বিপদে সান্ত্বনা বা সাহায্য, এগুলি সকলেরই কর্তব্য। ছাত্রজীবনেও এই সকল গুণের অনুশীলনে মনের উৎকর্ষ হয়। স্কুলের বা কলেজের কোন ছাত্রের অসুখ হইলে, বিশেষত যখন সে হোষ্টেলে থাকে, তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থার চেষ্টা করিবে। রোগী নিজের ঘরেই থাকুক বা হাসপাতালেই থাকুক, তাহার অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ লওয়া, তাহার ঔষধপথ্য প্রভৃতি কোন বিষয়ে কোন অভাব থাকিলে, তাহার পূরণ

করিবার চেষ্টা করিবে। কোন বিশেষ কাজ না থাকিলেও কিছুক্ষণ পাশে বসিয়া তাহার সহিত কথা বলিবে, সান্ত্বনা দিবে, আশার কথা শুনাইবে। আমরা যখন হিন্দু হোষ্টেলে ছিলাম, তখন হোষ্টেলে অনেকগুলি ছাত্র ছিলেন, যাঁরা সর্বদাই অসুস্থ ছাত্রগণের শুশ্রূষাদি করিতেন। একবার অনেকগুলি ছাত্রের জলবসন্ত হয়। ইহাদিগকে হোষ্টেলের মাঠের দক্ষিণদিকের দোতলা বাড়ির দুইটি ঘরে রাখা হইয়াছিল। হোষ্টেলের কতকগুলি ছাত্র পালা করিয়া ইহাদিগকে শুশ্রূষা করিত। এই সকল শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে একজন জলবসন্তের রোগীর সংস্পর্শে আসিয়া নিজেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার শুশ্রূষার কর্তব্যে অবহেলা হয় নাই। একবার আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় শুশ্রূষার কাজ করিতে করিতে আবার এই রোগে আক্রান্ত হন। বহুদিন রোগভোগ করিয়া আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু তাঁহার একটি কান বধির হইয়া যায়। হোষ্টেলের ছাত্রদের প্রতি এমন দরদ অতিশয় বিরল।

সেবাধর্ম মহৎ কর্তব্য। শুধু রোগে নহে, সহপাঠীদের অন্য প্রকার অভাব-অভিযোগে সহায়তা করাও হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। অনেক সময়ে অভাবগ্রস্ত ছাত্রকে পুস্তক দ্বারা বা অর্থ দ্বারা সহায়তা করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্কুলে বা কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের মনোযোগ থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনেও তাঁহারা বিবিধ প্রকার জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

দেশে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দুর্যোগে বহু নরনারী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অর্থসংগ্রহ, বস্ত্রসংগ্রহ, সাহায্যবিতরণ, প্রভৃতি বহু কার্যে ছাত্রগণের উৎসাহ দেখা যায়। যাঁহারা সরল চিত্তে এই সকল কার্যে যোগদান করেন,

তাঁহাদের মনের ঔদার্য বর্ধিত হয় এবং বিবিধ প্রকার অভিজ্ঞতাও জন্মে।

এই সকল সামাজিক জনহিতকর কার্য অতীব প্রয়োজনীয় হইলেও, এই সকল কার্যের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা কোন ছাত্রের পক্ষেই কর্তব্য নয়। এই সকল কার্য মহৎ কার্য। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনে এই সকল কর্তব্য পালন করিতে গিয়া নিজের অধ্যয়ন-কার্য অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যাহত করা কখনই কর্তব্য নয়। বরং অধ্যয়ন-কার্য যথাযথরূপে সম্পন্ন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অধিকতর শক্তি ও উৎসাহ দ্বারা আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণ সাধন করিবার শক্তি অর্জন করাই শ্রেয়।

স্বদেশের প্রতি সকলেরই কর্তব্য আছে। দেশকে দেশমাতৃকারূপে অনুভব করিয়া নিজেকে তাঁহার সন্তানরূপে কল্পনা করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জন্মভূমির সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য দেশের প্রত্যেক নরনারীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। দেশমাতৃকার প্রকৃত মঙ্গল করিতে হইলে প্রত্যেক নরনারীকে উপযুক্ত সন্তান হইতে হইবে। ছাত্রজীবনই সকল প্রকার আত্মোৎকর্ষসাধনের প্রকৃষ্ট সময়। বিদ্যায়, জ্ঞানে, ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং জীবনের অন্য সর্বক্ষেত্রে নিজেকে বলীয়ান্ ও কর্মিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিবে, তুমিও অন্য দশ জনের মত দেশেরই একজন সন্তান। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তোমারও যোগ রহিয়াছে। তোমার মুখ্য কর্তব্য অধ্যয়নের কোনরূপ অবহেলা না করিয়াও স্বদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রভৃতির অবস্থা ও উৎকর্ষসাধনের বিবিধ প্রয়াস সম্বন্ধে অবহিত হইবে। এই সকল বিষয়ে

সচেতনতা ও জ্ঞানলাভ ব্যতীত অন্য কিছু করিবার সুযোগ ছাত্রজীবনে হইবে না। কোন গুরুতর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কার্যে আত্মনিয়োগের সময় ছাত্রজীবন নহে। কোন বিশেষ প্রতিভাবান, আত্মত্যাগী, আদর্শ-বান ছাত্র হয়তো ছাত্রজীবন হইতেই দেশমাতৃকার সেবার উচ্চাদর্শে স্বকীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারেন, কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা অতি বিরল।

দেশের ও সমাজের অগণিত সমস্যা রহিয়াছে। ইহার যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া শুধু ছাত্রজীবন নহে, সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের মূল কর্তব্য ভুলিয়া সাময়িক উত্তেজনাবশে বা আবেগের প্রেরণায় কর্তব্যভ্রষ্ট হইলে পরম অমঙ্গল হইবে। বহু ছাত্র এই আপাতলোভনীয় উত্তেজনার বশে এবং ক্ষণিক প্রশংসালাভের মোহে পথভ্রষ্ট হইয়া অধ্যয়নে অবহেলা করিয়া সমগ্র জীবন ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন।

কোন গুরুতর দেশহিতকর কার্য বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত হইতে হইলে, অধ্যয়নপর্ব শেষ করিয়া তাহার পর নিজের বাঞ্ছিত পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে বয়স, বিবেচনাশক্তি ও দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, এবং নিজের কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্টতর মনোভাব জন্মে। তখন নিজের রুচি, মনোবল এবং আদর্শ অনুসারে নিজের কর্মপন্থা স্থির করা সহজ ও সম্ভব হয়। ছাত্রজীবনে পূর্ণ দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মে না, বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে সীমাবদ্ধ। এই সময়ে কোনমতেই অধ্যয়ন-তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না।

সত্যনিষ্ঠা ও বিবেকনিষ্ঠা

মানবজীবনের মহত্ত্বের মূলভিত্তি সত্যনিষ্ঠা ও বিবেকনিষ্ঠা। শাস্ত্রে আছে, সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যই মানবের শেষ অবলম্বন। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে মানুষ মানবতা হইতে ভ্রষ্ট হয়। সত্যনিষ্ঠায় মন পবিত্র হয়, বলশালী হয়, আদর্শ উন্নত হয়, কর্মপ্রচেষ্টা শুভ হয়। ছাত্রজীবনই মনুষ্যত্বগঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে সর্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিবে। পিতামাতার সহিত, ভ্রাতা, ভগিনী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত, সহপাঠীগণের সহিত, শিক্ষকগণের সহিত এবং অন্যান্য পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সর্বদা সত্য কথা বলিবে এবং সত্যসম্মত ব্যবহার করিবে। সত্য কথা বলিবার উপদেশ অত্যন্ত পুরাতন হইলেও উহার মূল্য কখনও হ্রাস পায় না। যুগে যুগে মানুষ সত্যের উপাসনা করিয়াছে, সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষগণকে পূজা করিয়াছে। পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা এবং পিতৃভক্তির আদর্শ মানবসমাজে সত্যনিষ্ঠার উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিয়াছে এবং সত্য-পালনজনিত তাঁহার সমগ্র জীবনের মর্মান্তিক বেদনা জগতের মনে অমর হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্রের নামের স্মরণে ও গানে মানুষের মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়। জগতের সকল মহাপুরুষ ব্যক্তিগণই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সত্যহীন মানুষ বহু বাহ্য বিষয়ে উন্নতি ও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত মানবিকতার মানদণ্ডে তিনি অতি দরিদ্র ও অতি হীন।

আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক সময়ে অসত্যভাষণ প্রয়োজন মনে হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রয়োজন কি না সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন, অনেক মহৎ কার্যের জন্য বৃহৎ মিথ্যা-কথার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সত্য সত্যই এবং মিথ্যা মিথ্যাই।

মিথ্যার ভিত্তির উপর কোন মহৎ কার্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সাংসারিক জটিলতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শ জীবন সত্যনিষ্ঠ জীবন। আদর্শ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও আদর্শ আদর্শই থাকে। সকলের পক্ষে সব সময়ে সত্য কথা বলা সম্ভব হয় না বলিয়াই অসত্যভাষণ আদর্শ হইতে পারে না।

ছাত্রজীবনে সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবে। একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবে, মিথ্যাভাষণের প্রয়োজনীয়তা নাই। কোন ক্লাসে উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বারা উপস্থিতির ব্যবস্থা করা একটি অতি হীন মিথ্যাচার। কখনই এই মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হইবে না। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। বিদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাসে দেখিয়াছি, ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য নাম-ডাকা বা রেজিস্টারে লেখা হয় না। কিন্তু তাহাদের ক্লাসে উপস্থিতির দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। ইহা কেমন করিয়া হয়, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ছাত্রেরা ক্লাসে প্রবেশ করিবার সময়ে দরজার পাশে ঝুলান একটি ছিদ্রবিশিষ্ট বাক্সে তাহাদের নামসম্বলিত এক টুকরা কাগজ ফেলিয়া যায়। তাহা হইতেই পরে তাহাদেব উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা হয়। ছাত্রেরা সত্যনিষ্ঠ না হইলে এ ব্যবস্থা সম্ভব হইত না। সুতরাং যে অসত্য ব্যবহার আমাদের দেশের বহু ছাত্রের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয়, তাহা অন্যত্র অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। শুধু এই বিষয়ে নহে, অন্য সকল বিষয়েও পরিপূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে।

কাহারও নিকট হইতে পুস্তক লইয়া প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ না করা একপ্রকার মিথ্যাচার। কখনই ইহা করিবে না। অনেক সময়ে পুস্তক প্রত্যর্পণ করিতে একেবারেই ভুল হইয়া যায়। এরূপ ব্যবহার ভাল নহে।

সংসারের অধিকাংশ লোকে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, সুতরাং মিথ্যা কথা দূষণীয় নহে, এরূপ ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত। অধিকাংশ লোকে কোন অন্যায় বা অসৎ অভ্যাসের দাস বলিয়াই তাহা অন্যায় বা অসৎ নহে, এরূপ হইতে পারে না। মহামারীর সময়ে অধিকাংশ লোক কোন রোগে আক্রান্ত হইলেও, সেই রোগ রোগই। তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। মানুষের সভ্যতা যত জটিল হইতেছে, সামাজিক জীবন যত ক্লেশময় হইতেছে, জীবনযাপনের সরলতা ও সহজতা বিলুপ্ত হইতেছে, ততই তাহার অন্তরের সহজ সুন্দর ভাব ও চিন্তা কলুষিত হইতেছে। সেইজন্য প্রতিনিয়ত অসত্যের ব্যবহার এবং সত্যের অবমাননা বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্রজীবনে সংসারের সহিত সংঘাত প্রবল নয়। এই সময়ে মন সরল ও সতেজ থাকে। এই সময়ে সকল ছাত্রেরই কর্তব্য কায়মনোবাক্যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া। কখনও কোন মতেই অসত্যের আশ্রয় লইবে না।

ক্লাসে প্রক্সি দেওয়া, নির্দিষ্ট দিনে পুস্তকাদি প্রত্যর্পণ না করা, প্রভৃতি বহু প্রকারে ছাত্রেরা অসত্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। এক ব্যক্তির বাস বা ট্রামের মাসিক টিকিট অন্যের বলিয়া ব্যবহার একটি মিথ্যাচার। স্কুলে বা কলেজে ভর্তির সময়ে জ্ঞাতসারে ভুল বয়স বলা বা লেখা একটি অতি সাধারণ মিথ্যাচার। বহু শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং ধর্মাভিমানী ব্যক্তিরাও এই মিথ্যাকে অন্যায় বলিয়াই মনে করেন না। ছাত্রগণ এই সকল মিথ্যাচার হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে।

কোন অসত্যকেই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিবে না। কাহারও পকেট হইতে একটি পয়সা চুরি করাও যেমন চুরি, কোন ব্যাঙ্ক হইতে এক লক্ষ টাকা চুরি করাও চুরিই, আর কিছু নহে। তেমনি বিষয় যতই তুচ্ছ হউক, অসত্যকে সর্বদা অসত্য বলিয়াই ঘৃণা করিবে। মহা-

ভারতে আছে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মাত্র একটি মিথ্যা কথার জন্য নরকদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য নিজের প্রতি এক প্রকার মিথ্যাচার। এ বিষয়েও আমাদের অতি জটিল এবং কুটিল সাংসারিক পরিস্থিতি আমাদিগকে মিথ্যাচারী করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। তথাপি মনস্বী ব্যক্তিরা যথাসাধ্য এই হীনতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছাত্রজীবনে মনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা থাকে বলিয়া এই সময়ে নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বীয় কর্তব্য ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই মূল্যবান সময়টিতে মনের সর্বপ্রকার সদ্‌গুণ-রাজির বিকাশ ও অনুশীলনে যত্নবান হইবে। এই সময়ে বিবেক ও ব্যবহারের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। যখন যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিবে। যখন যাহা ন্যায় বলিয়া মনে করিবে, কোনমতেই তাহা হইতে বিচলিত হইবে না।

অনেক সময়ে হয়তো মনে হইবে, সত্য কথা বলিতে গেলে ক্ষতি হয়। অসত্য কথা বলিলে বা অসত্য ব্যবহারে লাভ হয়। কিন্তু এই-রূপ লাভ প্রকৃত লাভ নহে। ইহাতে যে লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা মানসিক অধোগতির জন্য যে ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ ও মূল্য অনেক বেশি। সংসারে অনেক সময়েই আমরা কিসে প্রকৃত লাভ এবং কিসে প্রকৃত ক্ষতি হয় তাহা বুঝিতে পারি না। বাহ্যত লাভ হইলেও অসত্যের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য নয়। অসত্যের সহায়তায় আর্থিক এবং অন্য বহু প্রকার লাভ হইতে পারে। সত্যপথে বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতে পারে। তথাপি সর্বদা মনে রাখিবে, বাহ্য আর্থিক বা অন্য প্রকার লাভই মানবজীবনের সার্থকতার মানদণ্ড নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মৌলিক সার্থকতার পক্ষে সত্যবাদিতা একান্ত অপরিহার্য। সত্যপথ

হইতে বিচ্যুতিকে বিচ্যুতি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কোন প্রকারেই উহা সমর্থনযোগ্য নহে।

যে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর নাম যুগ যুগ ধরিয়া মানবের মনে ভক্তি ও পূজার উৎস খুলিয়া দিয়াছে, কোটি কোটি নরনারীর মনে ও জীবনে অদ্ভুত আদর্শনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার মহিমা সমুজ্জল করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের সাংসারিক জীবনে সুখের লেশমাত্র ছিল কি? রাজপুত্রের রাজ্যত্যাগ, রাজনন্দিনী ও রাজমহিষীর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বনবাসের অসহ দুঃখবরণ, তারপর রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, সীতার অবরোধ, রামচন্দ্রের সাগরবন্ধন, রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, সীতার উদ্ধার সুখের ইতিহাস নয়। তারপর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াও প্রজারঞ্জনব্রত রামচন্দ্রের পরম প্রিয়তমা ধর্মপত্নীকে নির্বাসন, সাংসারিক গ্লানিতে মর্মাহত সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশ, এই সকল কোন ঘটনাই সুখের কাহিনী নয়। এই পরম দুঃখময় জীবন কোন মন্ত্রবলে যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি নরনারীর মনকে আনন্দ-বেদনায় আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেই মানবমনের প্রকৃত মৌলিক ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ধন নয়, মান নয়, ঐশ্বর্য নয়, রাজ্য নয়, সত্য-ধর্মই মানবমনের চিরন্তন শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

চরিত্রগঠন

সবপ্রকার কর্ম ও চিন্তার সংযমসাধনই চরিত্রগঠন। ছাত্রজীবনই সর্বতোমুখী সংযমশিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। আহারে, বিহারে, কথোপকথনে, দৈনন্দিন কার্যকলাপে, অধ্যয়নে, চিন্তায়, সর্ববিষয়ে পূর্ণ সংযম চরিত্রের দৃঢ়তার লক্ষণ। কখনও অসৎ চিন্তা মনে স্থান দিবে না, কোন অসৎ কার্যে যোগ দিবে না, কোন অসাধু উপায় অবলম্বন করিবে না, কোনরূপ অসৎসংসর্গে থাকিবে না, কোনও প্রকার অসৎ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে না, কোন অসদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিবে না।

নিজের প্রতি অবিচলিত আস্থা রাখিতে হইবে। অহংকার করিবে না, কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারাইবে না। তোমার নিজের মত আছে, সংস্কার আছে, রুচি আছে, শক্তি আছে, চিন্তা আছে, বুদ্ধি আছে একথা সর্বদা মনে রাখিবে। তুমি নিজ শক্তিতেই সংযত হইবে, শৃঙ্খলাপরায়ণ হইবে। যাহা ভাল বুঝিবে, তাহা করিবার মত শক্তি তোমার আছে, ইহা বিশ্বাস করিবে। অপরের মতামত শুনিবে, বিচার করিবে, কিন্তু নির্ভর করিবে নিজের বিচারের উপর। পিতামাতা বা শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক অথবা গুরুর অনেক উপদেশ হয়তো নিজের বিচারবুদ্ধিসম্মত না হইলেও কখনো কখনো মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ প্রকার মতামতে বিভ্রান্ত হইয়া নিজ ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিবে না। নিজের শক্তিতে, নিজের পরিশ্রমে, নিজের মনোবলে নিজেই জীবনপথে অগ্রসর হইব, সাফল্যলাভ করিব, জীবন সার্থক করিব, এমনি একটা আত্মবিশ্বাস সর্বদা মনে পোষণ করিবে। এই আত্মবিশ্বাস না থাকিলে সাফল্যলাভ করা অতি কঠিন। এই আত্মবিশ্বাস থাকিলে বহু সত্য ও কল্পিত বাধা দূরে চলিয়া যাইবে।

মনের মধ্যে সর্বদা সাধু সংকল্প পোষণ করিবে। অধ্যয়ন, গবেষণা, ভবিষ্যৎ কর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটি দৃঢ় ও সরল বিশ্বাস ও সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইবে। অধ্যয়ন বা অন্য কোন বিষয়েই পূর্ণ সংকল্প না থাকিলে সামান্য বাধাতেই কর্ম ব্যাহত হইবে, উৎসাহ হ্রাস পাইবে, কর্মে অনিচ্ছা জন্মিবে, সময়ের অপচয় হইবে, শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্য দূরে সরিয়া যাইবে, সফলতা বিফলতায় পরিণত হইবে। কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে বহু চিন্তা করিবে, বিবেচনা করিবে, পরামর্শ করিবে। কিন্তু কার্য আরম্ভ করিয়া আর পশ্চাৎপদ হইবে না। সর্বপ্রকার বাধা, বিঘ্ন, সমালোচনা, নিন্দা, প্রশংসা উপেক্ষা করিয়া স্থিরসংকল্প হইয়া একাগ্র মনে অগ্রসর হইবে। একজন ছাত্র বিদেশে গিয়াছিলেন একাউন্টান্সি পড়িতে। ওই বিষয় কঠিন মনে হওয়ায় তিনি শিক্ষণ-ডিপ্লোমার জন্য পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেও মন বসিল না বলিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাও কিছুদিন মধ্যেই বিস্বাদ হইয়া উঠিল। তখন তিনি দন্তচিকিৎসা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সংকল্প ও একাগ্রতার অভাবের এরূপ দৃষ্টান্ত বেশি না থাকিলেও, অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পের অভাবে অনেক স্থলে সফলতা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। দৃঢ় সংকল্প ছাত্রজীবনের এবং পরবর্তী জীবনের সাফল্যের একটি প্রধান সহায়।

নিজের কর্মশক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস মনে স্থান দিবে। কোন কাজ, পারিব না, বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে না। নিজের মনে নিজের শক্তির প্রতি অদম্য বিশ্বাসই বহু ছাত্রকে সর্বপ্রকার সাফল্যের অধিকারী করিয়াছে।

স্বকর্মে, স্বকর্তব্যে নিষ্ঠা এবং তাহাতেই আত্মতুষ্টিলাভ উন্নতি-লাভের একটি পরম বন্ধু। জগতে সকলেই সকল কার্য করিবে এমন কখনো হইতে পারে না। একটি শকটচালক এরোপ্লেনচালক নাও

হইতে পারে। একজন অধ্যাপক চিকিৎসক নাও হইতে পারেন। সেজন্য কাহারও অসন্তুষ্টির কারণ নাই। ছাত্রজীবনেই হউক বা পরবর্তী জীবনেই হউক, যাহার যে কর্তব্য, যে সাধনা, যে আদর্শ, যে কল্পনা, তাহাতেই তাহাকে পরম পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে। অন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিবিধ প্রকার কার্যকলাপ দেখিয়া নিজ মনে অসন্তোষ পোষণ করিলে নিজের কর্তব্যের, নিজের সাধনার পরম ক্ষতি হইবে। জগতে সকল প্রকার কর্মেরই স্থান আছে। স্ব স্ব কর্মে ও কর্তব্যে নিষ্ঠাবান না হইলে কেহই মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারে না।

ছাত্রজীবনের পরীক্ষাদির ব্যাপারেই হউক বা পরবর্তী জীবনের কর্তব্যপালনেই হউক, বহু বাধা, বহু সমস্যা, বহু প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্বীয় শরীর ও মনের অসুস্থতা, প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হইবে। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হইবে না বা আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে বিলম্ব ঘটিবে বা সাধনা ও শ্রমের পর্যাপ্ত পুরস্কার লাভ হইবে না। সাংসারিক জীবন অতি জটিল। বহু প্রকার বহু কারণপরম্পরা আমাদের পরিকল্পিত কর্মপথে বিঘ্ন ঘটায়। ইহার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। কোন সাধনায় সম্পূর্ণ বা আংশিক বিফলতায় ভগ্নমনোরথ হইয়া মনোবল হারাইবে না। যে কোন সাধনার সহিত সফলতা ও বিফলতা জড়িত থাকিবেই, এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

সচ্চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে সৎসঙ্গ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যদি কখনও সৎসঙ্গের অভাব হয়, তখন বরং একাকী থাকিবে, তথাপি কুসঙ্গে মিশিবে না। চরিত্রগঠনের পক্ষে বহুবান্ধবতা ভাল নয়। বহু-বান্ধব ব্যক্তি পরিণত বয়সে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক ও সামাজিক জীবনের আনন্দের উচ্ছলতা হয়তো ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু

ছাত্রজীবনে চরিত্রের মূল ভিত্তিরচনায় সময়ে বহুবান্ধবতা শুভ নহে। ইহাতে মনের দৃঢ়তা, এবং বাক্যের ও কর্মের সংযম ব্যাহত হয়।

মনকে নির্মল এবং প্রফুল্ল রাখিতে, কর্মকে অনাবিল সাধনায় পরিণত করিতে যে সকল অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হয়, যে সকল বিধিনিষেধ পালনীয় বলিয়া মনে হয়, কোন তুচ্ছ কারণে বা কোন গুরুতর অজুহাতে তাহা বর্জন করিবে না। অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকার কারণ দেখাইয়া বা অনেক প্রকার উপদেশ দিয়া হয়তো তোমার সংকল্পিত মত ও পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে বিচলিত হইয়া বা প্রভাবিত হইয়া নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিবে না। মনে কর, তুমি স্থির করিয়াছ, কোন একটি ঘৃণ্য পানীয় পান করিবে না বা স্পর্শ করিবে না। তুমি দেখিবে সংসারে এমন অনেক পানদোষদুষ্ট ব্যক্তি আছে, যাহারা অন্যকেও এই দোষে কলঙ্কিত করিতে চায় এবং এজন্য নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন দূষণীয় বা ঘৃণিত কর্ম নাই, যাহার স্বপক্ষে যুক্তি বা তর্কের সমর্থন নাই। সুতরাং যুক্তি ও তর্কদ্বারা সব সময়ে কর্তব্যকর্মবিষয়ে সমাধান করা যাইবে না। এস্থলে মনে দৃঢ় সংকল্প রাখিবে, পানদোষে কখনই লিপ্ত হইব না। বেশিও নয়, অল্পও নয়, একেবারে স্পর্শই করিব না, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প মনে রাখিবে। জ্ঞানী, পণ্ডিত বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনও উপদেশেও ইহা স্পর্শ করিব না, ইহা ভাল হউক, মন্দ হউক, বাঞ্ছনীয় হউক, অবাঞ্ছনীয় হউক, কখনই কোন মতেই ইহা স্পর্শ করিব না, এমনি একটা অদমনীয় সংকল্প অর্জন করিবে। অধিকাংশ হিন্দুবিধবা যেমন কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়াই আমিষাহার বর্জন করেন, কোন প্রকার যুক্তি তর্কদ্বারা তাঁহাদের সংকল্প ভঙ্গ করা যায় না, ঠিক তেমনি পানদোষ সম্বন্ধেও ছাত্রজীবন হইতেই

একটি গভীর ঘৃণা এবং অধর্মবোধ অর্জন করিবে। তাহা হইলে পরবর্তী জীবনের কোন প্রলোভনই তোমাকে প্রলুব্ধ বা সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবে না।

প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার কিছুক্ষণ নীরবে ও নিভৃতে বসিয়া সমস্ত দিনের বা সপ্তাহের কর্ম ও চিন্তা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে। সংকল্পিত কর্মপন্থা বা চিন্তাধারা হইতে যে সকল বিচ্যুতি হইবে, তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবে। সচ্চরিত্র গঠনের পক্ষে নিয়মিতরূপে আত্মবিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য মনের স্বাস্থ্যবিধান, মনের বিকাশসাধন এবং মানসিক শক্তির উন্নতিসাধন। বিদ্বান এবং মনীষী ব্যক্তিরা যে বিদ্যা এবং যে জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহার সহিত পরিচিত হইতে এবং তৎসহায়ে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিতে অধ্যয়ন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। গুরু বা শিক্ষকের মুখে মুখে বহু উপদেশ ও জ্ঞান অর্জিত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপে জ্ঞানলাভের সুযোগ অতি সীমাবদ্ধ। শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরায় বহু জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণের চিন্তারাশি পুস্তকে লিপিবদ্ধ না হইলে তাহা বিস্মৃত বা লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষা বা বিস্তার সম্ভব নয়।

শরীরের পক্ষে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, খাদ্য ব্যতীত শরীরের পুষ্টি-সাধন, স্বাস্থ্যরক্ষা, উন্নতিবিধান সম্ভব নয়, তেমনি অধ্যয়ন ব্যতীত মনের পুষ্টিসাধন স্বাস্থ্যরক্ষা এবং উন্নতিবিধান সম্ভব নয়। শরীরের জন্য যেমন নিয়মিতভাবে বিবিধ প্রকার স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন, তেমনি মনের জন্যও বিবিধ প্রকার স্বাস্থ্যকর অধ্যয়ন আবশ্যক। শরীরের খাদ্যের প্রয়োজনের এবং পরিমাণের সীমা আছে, কিন্তু মনের প্রসারের সীমা নাই। সেইজন্য অধ্যয়নেরও সীমা নাই। ছাত্রই হউন বা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউন, বালক, যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, যিনিই হউন না কেন, যিনি যত বেশি অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই তত বেশি জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহার মন বিবিধ জ্ঞানৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইবে, মনে অসীম আনন্দ জন্মিবে। এরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তি ছাত্র বা অপর বহু ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিতে পারিবেন। জ্ঞান এমনই একটি বস্তু যাহা অপরকে দান করিলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধিই লাভ করে।

অধ্যয়নদ্বারা মানুষের বহু বিস্তৃত জ্ঞানরাশি হইতে নিজ শক্তি ও রুচি অনুসারে বিবিধ প্রকার জ্ঞানসঞ্চয় করা যায়। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় এবং তদন্তর্গত আরও বিভিন্ন প্রকার শাখা প্রশাখায় জগতের জ্ঞানরাশি এত সঞ্চিত হইয়াছে, যে তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই জ্ঞানরাশির অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই একটি জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সেইজন্য নিজের রুচি, শক্তি ও সুযোগ অনুসারে অধীতব্য বিষয় নির্ণয় করিয়া লইয়া তত্তদ্বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়নই শ্রেয়। বহু বিষয়ের বহু প্রকার পুস্তকাদি পাঠেও এক প্রকার আনন্দ আছে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত গভীর জ্ঞানলাভ হয় না, অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

স্কুল বা কলেজে অধ্যয়নের একটি প্রধান উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী

অনুসারে কতকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানার্জন নহে। এই সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিলে অর্থোপার্জনের পথ সুগম হয়। কারণ ব্যবসায় ব্যতীত অন্য যে কোন কার্য করিতে গেলেই, তাহার প্রস্তুতির জন্য বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের আবশ্যক হয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও শিক্ষা ও অধ্যয়ন একেবারে অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থ, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রয়োজনই সর্বাপেক্ষা অধিক। আধুনিক যুগে উত্তমরূপে ব্যবসায় পরিচালনার জন্যও বিবিধ বিষয়ে অধ্যয়ন ও শিক্ষা অনেক সময়ে অপরিহার্য হইয়া উঠে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কৃতিত্বলাভ অনেক ক্ষেত্রেই কর্মারম্ভের প্রথম সোপান। অনেক প্রকার কার্য আছে, যাহা পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইবার উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং স্কুলের বা কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিকে কখনই অবহেলা করিবে না। যদি কেহ এই পরীক্ষা-সমন্বিত অধ্যয়নব্যবস্থার বাহিরে থাকিতে চায়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে ছাত্র স্কুলে বা কলেজে পড়িবে, তাহাকে পরীক্ষার জন্য সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে হইবে। পরীক্ষাগুলি অতি কঠিন। বর্তমানে পরীক্ষাব্যবস্থার যে রূপ বা প্রকৃতি, তাহা মনুষ্যত্ব-গঠনের পক্ষে প্রকৃত সহায়ক কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু সে সকল বিচার ছাত্রের কর্তব্য নহে। ছাত্র যে কর্তব্যপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে তাহা পালন করিতে হইবে। শুধু পরীক্ষা কেন, যে কোন কাজ করিবে, তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে। আলস্য, উদাসীনতা, দ্বিধা, প্রভৃতি মনে থাকিলে কোন কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না।

পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন সমগ্র বৎসর ধরিয়া সমভাবে করিবে।

পরীক্ষার বিলম্ব আছে মনে করিয়া কোন বিষয়ের অধ্যয়ন ফেলিয়া রাখিবে না। অনধীত বিষয় পুঞ্জীভূত হইলে স্বল্প সময়ে তাহা সম্যক্ আয়ত্ত করা যায় না। বহু ছাত্র এই ভ্রম করিয়া অবশেষে অনুতাপ করিয়াও প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না। পরীক্ষার পূর্বে স্বভাবতই সকলকে একটু বেশি পরিশ্রম করিতেই হয়। তার পর যদি পূর্বের অনধীত বিষয়ের জন্য আরও অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে। বহুক্ষেত্রে এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ছাত্রেরা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং সেজন্য পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে না।

পরীক্ষার পূর্বে বা পরীক্ষার সময়ে অত্যধিক উদ্বিগ্ন হইবে না। আহারাদি খেলাধুলা বা অন্য সমস্ত কর্তব্যবিষয়ে বিশেষ সংযত হইবে। শরীর ও মন উভয়ই যাহাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে তাহার চেষ্টা করিবে। বাল্যকালে একজন মাষ্টারমহাশয় রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পরীক্ষাকে কখনও অবহেলা করিবে না। পরীক্ষা অতি ভয়ানক বস্তু। এই পরীক্ষার ভয়ে স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার সীতাদেবী পাতালে পলাইয়া গিয়াছিলেন!' পরীক্ষা দিতে বসিয়াও উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হইবে না। প্রশ্নপত্র ভাল করিয়া পড়িয়া প্রথমে সহজ এবং পরে কঠিন প্রশ্নের উত্তর করিবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াই তাহা আবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবে। তারপর অন্য প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করিবে। এইরূপ পড়িয়া দেখা (revise করা) একেবারে শেষে করিবে বলিয়া রাখিয়া দিবে না। শেষে হয়তো সময়ই পাইবে না। সময় পাইলেও একসঙ্গে সমস্ত উত্তরগুলি পুনরায় ভাল করিয়া পড়িয়া দেখা (revise করা) সম্ভব হয় না। কোন একটি উত্তর লিখিবার পরেই revise করিলেই ঠিক revise করা হয়।

পরীক্ষায় অনেক দিন ধরিয়া অনেক প্রশ্নপত্র থাকে। কোন একটি পত্রের উত্তর ভাল না হইলে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে না। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে, তারপর পরের দিনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। যে পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আর আলোচনা করিবে না। এরূপ আলোচনায় লাভ তো নাইই, বরং অপ্রত্যাশিত কোন ভুল বাহির হইলে মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে। পরীক্ষা সম্পূর্ণ শেষ হইয়া যাইবার পর প্রশ্নের উত্তরাদি লইয়া আলোচনা করিতে পার। তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

প্রকৃত জ্ঞানলাভের পক্ষে পরীক্ষা একটি গৌণ ব্যাপার হইলেও ব্যবহারিক জীবনে ইহার মূল্য আছে। সেইজন্য সকল পরীক্ষাই যাহাতে সুষ্ঠুভাবে এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পার, সর্বদা তাহার চেষ্টা করিবে।

অধ্যয়নের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য সৎসঙ্গলাভ। ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে এমন অনেক সময় আসিবে যখন প্রকৃত সজ্জনের সঙ্গ দুর্লভ মনে হইবে। তখন সদ্‌গ্রন্থপাঠই সজ্জনসঙ্গের স্থান পূরণ করিতে পারে। উৎকৃষ্ট পুস্তকের কখনো অভাব হয় না। যে সকল সজ্জন এই সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের পুস্তকের মধ্যেই তাঁহাদের মনের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এই সান্নিধ্যে আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে। শুধু অবসর-বিনোদনের জন্য যে কোন পুস্তক অধ্যয়ন ছাত্রজীবনের পক্ষে শুধু অকর্তব্যই নহে, পরম অকল্যাণকর।

মানব-জীবন

দর্শনশাস্ত্রে মানবজীবনকে যাহাই বলা হউক না কেন, মানবজীবন একটি অতি মহৎ সত্তা। একটি মানুষ সমগ্র জীবনে যাহা কিছু কর্ম করে বা চিন্তা করে, তাহার এতটুকুও নিরর্থক নহে। তাহার প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের সহিত শুধু তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব নহে, সমগ্র মানব-সমাজের সত্তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এক ব্যক্তি যে সাধনা সম্পন্ন করে, বহু ব্যক্তি তাহার ফল ভোগ করে। জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষগণের জীবন হইতেই আমরা দেখিতে পাই, কেমন করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব সাধনাক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাদের সাধনালব্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কর্মের ফল সমগ্র জগতের মানুষকে কত বিচিত্ররূপে প্রভাবান্বিত করিতেছে। জীবনের দৈর্ঘ্যই তাহার সার্থকতার মানদণ্ড নহে। তাহার সাধনা, তাহার কর্মের পবিত্রতা, উদারতা, বিশ্বজনীনতা, প্রভৃতি মহৎগুণনিচয় তাহাকে জগতে অমর করিয়া রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র আটত্রিশ বৎসর ইহজগতে ছিলেন। তাহার মধ্যে মাত্র দশ বার বৎসর সামাজিক কার্যক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সামান্য সময়ের প্রচণ্ড তপোবল তাঁহার কর্মসাধনাকে যে মহিমা দান করিয়াছে, তাহার ঐশ্বর্য মানবসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া উপভোগ করিবে।

এই বিশ্বে সকলেরই স্থান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মহাপুরুষরাই মানুষ এবং অন্য সকলের জীবন বৃথা, এরূপ ধারণা অতীব ভ্রান্ত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বটবৃক্ষের যেমন মহিমা আছে, সার্থকতা আছে, তেমনি ক্ষুদ্র তৃণদলেরও মহিমা আছে, সার্থকতা আছে। কথায় আছে, the world knows very little of its great men.

কবি গ্রে লিখিয়া গিয়াছেন,

Full many a gem of purest ray serene
    The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
    And waste its sweetness in the desert air.

জগতে কাহারও জীবনই নিরর্থক নহে। সার্থকতার পরিমাণ আপাতচক্ষে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, প্রত্যেক মানুষের তাহার নিজের নিকট নিজের একটা মূল্য আছে, সমগ্র সমাজের মধ্যেও তাহার বিশিষ্ট স্থান আছে। কেহই অবান্তর নহে। এই কথা সর্বদা মনে রাখিয়া নিজের জীবনের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি ব্যবহার অতি সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবে। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মূল ভিত্তি ছাত্রজীবন। এই সময়েই জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিবে, এই জগতে, এই সমাজে, তুমি একটি বিশিষ্ট সত্তা। তোমার জীবনের একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে, তোমার নিজের কাছে, তোমার সমাজের কাছে, সমগ্র বিশ্বের কাছে। এই সত্তাকে সযত্নে জ্ঞানে ধর্মে কর্মে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছাত্রজীবনের সমস্ত শ্রম, সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত চিন্তাধারা যাহাতে তোমার জীবনকে সৎপথে চালিত করিতে পারে, মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, সে বিষয়ে মনে প্রাণে যত্নবান হইবে। জীবন একটা স্বপ্ন নয়, একটা খেলা নয়। যেমন তেমন করিয়া সময় কাটাইয়া দেওয়া জীবনের কর্তব্য নয়।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যতীত সকল মানুষেরই ঐহিক কামনা থাকে। প্রথমত মানুষ সুখের প্রত্যাশী। অশন, ভূষণ, বাসস্থান প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভোগবাসনা তাহার আছে। এই সকল সুখের উপকরণ

সংগ্রহ করিতে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং অর্থ মানুষের একটি প্রধান কাম্য। সুখান্বেষণ এবং অর্থান্বেষণ প্রত্যেক বক্তির কাম্য। কিন্তু ইহার জন্য যে যত্ন ও প্রচেষ্টা আবশ্যক, তাহা সহজ, সরল, নিষ্কলুষ না হইলে ব্যক্তির এবং মানবসমাজের অকল্যাণ ঘটে। সুতরাং সুখ-সাধনা এবং অর্থ-সাধনাকেও সর্বপ্রকারে সংযত, সংহত ও সুশৃঙ্খল করিতে হইবে। এই সংযম ও শৃঙ্খলাজ্ঞান অর্জনের পক্ষে ছাত্রজীবনই প্রকৃষ্ট সময়। যিনি যে কোন পথে, যে কোন উপায়েই অর্থোপার্জন করুন না কেন, এক সময়ে তিনি ছাত্র ছিলেন। এক সময়ে তিনি জ্ঞানার্জন এবং চরিত্রগঠনের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান ও সাধনা তাঁহার পরবর্তী জীবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে। যদি এই ছাত্রজীবন তিনি সার্থকরূপে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পরবর্তী জীবনও সার্থক হইবে।

সুখ ব্যতীত মানুষ শান্তিও চায়। বিবিধ ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিলে মানুষ নিজেকে সুখী মনে করে। কিন্তু তাহাতে সব সময়ে শান্তি হয় না। কলহ, ব্যাধি, শোক প্রভৃতি বহু কারণে মানুষ শান্তি হারায়। সুখের বহু উপকরণ সত্ত্বেও মানুষ শান্তি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। ভোগের উপকরণ যত অধিক হইবে, অশান্তির সম্ভাবনাও তত বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য ভোগ সম্পর্কেও সংযম ও শৃঙ্খলা আবশ্যক। সংযত ও সুশৃঙ্খল না হইলে ভোগও সম্পূর্ণ হয় না। বরঞ্চ ভোগের উপকরণ যাহার যত অল্প, শান্তির সম্ভাবনা তাহার তত বেশি। মহাভারতে আছে, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জগতে প্রকৃত সুখী কে ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

যে ব্যক্তি অতি সাধারণভাবে স্বীয় প্রয়োজনানুরূপ আহারাদি করে, কাহারও নিকট ঋণ করে না বা ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া প্রবাসে যাইবার প্রয়োজন বোধ করে না, সেই প্রকৃত সুখী। এই আদর্শ বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে উপযোগী বা সম্ভব না হইলেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে অত্যুগ্র ভোগলালসা মানুষকে প্রকৃত সুখ বা শান্তি দিতে পারে না। সর্ববিষয়ে শান্ত, নিষ্কলুষ, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে পারিলেই প্রকৃত শান্তি ও সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

কোন সৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসৎ পন্থা নিন্দনীয় নয়, এইরূপ একটা ধারণা কাহারও কাহারও মনে উদিত হইয়া থাকে। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা কর্তব্য নয়। জীবনের মূল্য তাহার পবিত্রতায়, চিন্তার সমৃদ্ধিতে, জ্ঞানের প্রসারতায়, আস্তিক্যবুদ্ধির দীপ্তিতে। এইগুলিকে বিসর্জন দিয়া বা অধঃপতিত করিয়া কোন মহৎ কার্যের সম্পাদন সম্ভব নয়। বাহিরের হট্টরোলে, জনসমাজের করতালিতে, আপাতরম্য প্রতিষ্ঠার বিশালতায় মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ, প্রকৃত জয়যাত্রা সূচিত হয় না। কোন অপকার্যের ভিত্তিতে মহৎ জীবন লাভ করা যায় না।

সুখ, শান্তি, অর্থ, প্রভৃতির বাহিরেও আর একটি কামনা মানুষের মনে জাগ্রত রহিয়াছে। এই কামনা যশোলিপ্সা। এমন কোন মানুষ নাই, যিনি কোনপ্রকার যশঃপ্রার্থী নহেন। সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী গিরি-গুহাবাসী সন্ন্যাসী ব্যতীত প্রত্যেক মানুষই স্বপ্রচার বা যশঃপ্রার্থনা করিয়া থাকে। এমনও শুনা গিয়াছে, ভস্মজটাধারী বিবসন সন্ন্যাসীরা হস্তিপৃষ্ঠ-সমারূঢ় হইয়া সন্ন্যাসীসম্মেলনে গতায়াতের সময়ে ক্যামেরা সম্মুখে দেখিলেই জটা সুবিন্যস্ত করিয়া হৃষ্টবদনে ক্যামেরার দিকে চাহিয়া থাকেন। ইংরাজিতে একটি কথা আছে, যশোলিপ্সা হইতেছে the

last infirmity of the human mind. যাহার সকল আশার শেষ হইয়াছে, তাহারও মনে যশোলাভের আশা জাগ্রত থাকে। মনে রাখিতে হইবে, এই যশোলাভ ব্যক্তির সাধনার উপরেই নির্ভর করে বেশি, যদিও অন্যান্য বহুবিধ অবান্তর ব্যাপারও ইহার সহিত জড়িত থাকে। যিনি প্রকৃত সুধী ও জ্ঞানী, তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, যশোলাভের জন্য কোন বিশেষ প্রকার বিশিষ্ট উপায় বা কৌশল অবলম্বন প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য নহে। যিনি জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছেন, তাঁহার মন নিন্দা প্রশংসার ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতে চেষ্টা করিবে। মানবজীবনের সকল সাধনা ও সকল প্রচেষ্টার আরম্ভ ছাত্রজীবনে। তাই ছাত্রজীবনেই আরম্ভ করিবে এই সংযমশিক্ষা। নিজের কর্তব্যকর্ম যথাযথ ভাবে করিয়া যাইবে। কখনও প্রশংসা পাইবে, কখনও পাইবে নিন্দা। নিজের বিবেকবুদ্ধি প্রখর থাকিলে, ইহার কোনটিই তোমাকে বিপথগামী করিয়া কর্তব্যচ্যুত করিতে পারিবে না।

সকল প্রকার পার্থিব ঐশ্বর্যের মধ্যেও মানুষের মন চলিয়া যায় তাহার ঊর্ধ্বে। মানুষ চায় এমন একটা কিছু, যাহা তাহার মনকে, আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারে, অভিভূত করিতে পারে, অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত করিতে পারে, যাহা রোগ, শোক, সম্পদ, আপদ, সকলই জয় করিতে পারে। এই অনির্বচনীয় বস্তুটিকে আমরা আত্মধর্ম বা স্বধর্ম বলিতে পারি। ধর্মের প্রতি অনুরাগ মানুষের সহজাত একটি গুণ। যাহার মন প্রাণ ধর্মের পূতধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার সুখ শান্তি কোন পার্থিব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। এই ধর্মপ্রাণতা অর্জন অতীব কঠিন। ছাত্রজীবন হইতেই ইহার স্ফুরণ ও বিকাশ হইতে থাকে। সংযম, পবিত্রতা, সাধনা ও একাগ্রতার বলে এই মহত্তম আদর্শের পথে অগ্রসর হইলে মানুষ পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

প্রবন্ধ	
গণিতের ভিত্তি	·৫০
শিক্ষার কথা	২·০০
জীবনী	
বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন	১·০০
প্রবন্ধ ও গল্প	
লেখা	৩·০০
ছোটগল্পের বই	
শুভশ্রী	১·৫০
মজলিস	১·৫০
কথিকা	১·৫০
ভজহরি	১·৫০
রুল-অফ-থ্রি	২·৫০
ভজহরির সংসার	৩·০০
ফাংশন	৩·০০
গল্প-সংগ্রহ	
ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প	৫·০০
নাটক	
কলের গরু	২·০০
উপন্যাস	
পূর্ণিমা	৩·৫০
কবিতা	
ভাগীরথী	১·৫০
স্বাস্থ্য-বিষয়ক	
পঞ্চাশের পরে	২·৫০
ভাষা-বিষয়ক	
German Word Book	1·50
French Word Book	1·00

